রুচিহীন

....

নজরুল ইসলাম

পরিবেশক

লি পি কা

৩০/১-এ কলেজ রো, কলকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬১

প্রকাশক :
ডি. চক্রবর্তী,
৩০/১-এ কলেজ রো
কলকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক :
শরৎচন্দ্র প্রধান
মহাপ্রভু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন।
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রভাস

সূচিপত্র

আত্মহত্যার দায়

দুপুরবেলায় খাবার পর একটু ভাতঘুম এসেছিল। কর্কশ শব্দ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। নীলকণ্ঠ চোখ বন্ধ করেই রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিল। ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমি নিউ টাউন থানার ওসি বলছি।"

নীলকণ্ঠ চমকে উঠল, থানা থেকে তাকে ফোন কেন? বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, "বলুন।"

"নীলকণ্ঠবাবু আছেন?"

"বলছি।"

"ও! আপনিই বলছেন? আপনার বিরুদ্ধে আমার কাছে একটা অভিযোগ এসেছে।"

নীলকণ্ঠ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। থানা-পুলিশকে তার খুব ভয়। ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। তারা নাকি ধুলো দিয়ে দড়ি পাকায়। তাদের অফিসের বড়ো সাহেব তহবিল তছরূপ করল। ধরে হাজতে পুড়ল ক্যাশিয়ার করিমকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কে করতে যাবে? এরমধ্যে নিশ্চয় কোনো বদ মতলব আছে। ওরা কি কোনওরকম চাপ দিয়ে তার কাছ থেকে ঘুষ আদায় করতে চাইছে? সে তো কিছু করেনি।

কণ্ঠস্বর বলে চলল, "আপনি থানায় আসবেন? না, আমি আপনার বাড়ি যাব?"

থানায় যাওয়া আর বাড়িতে পুলিষশ আসা দুটোতেই তার ভয়। কিন্তু এখন উপায়? থানায় না গেলে বাড়িতে আসবে। লোকে দেখবে। পাঁচ কথা ভাববে। তার থেকে থানায় যাওয়াই সই। নীলকণ্ঠ বলল, "না না, আপনাকে আর আসতে হবে না। আমিই যাব। কখন যাব বলুন?"

"এখন তো আড়াইটে বাজছে। চারটে নাগাদ চলে আসুন।"

"চলে যাব।"

চট্ করে চলে যাব বললেও নীলকণ্ঠ সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল। কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে? কী অভিযোগ? থানায় গেলে ওরা যদি হাজতে পুরে রেখে দেয়। তার তো কারও সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই। চাকরি থেকে অবসরও নিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। তার আগেই তার স্ত্রী মারা গেছে। আজ যদি সরমা থাকত! সরমার মেয়ে মলি স্বামীসহ তার এই বাড়িতেই থাকে। তাদের সঙ্গে কি একবার পরামর্শ করে নেবে? তাহলে তো ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তার থেকে সে একাই যাবে।

নীলকণ্ঠ বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল। আয়নাতে তার মুখটা খুব করুণ দেখাল। ধুতির ওপর হাফশার্টটা চড়িয়ে নিয়েই রওনা হল। পথে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল।

২

এখান থেকে অনেক দূরে নলবাটরা গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ি বলতে পিসির বাড়ি। গঞ্জের হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে এখানে পাশের গ্রামের সুভাষকাকার হাত ধরে সদরের হাসপাতালে স্টোরকিপারের কাজ নিয়ে এসেছিল। তখন অত কম পাশেই এসব চাকরি পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যায় না। এই তো পাঁচ বছর আগে তার অবসরের পর যে ছেলেটি ঢুকল সে বি. এসসি. পাশ। বেতনও কত কম ছিল। প্রথম ঢুকে পেত মাত্র ষাট টাকা। অবশ্য জিনিসপত্রের দামও কম ছিল। কোনোরকমে চলে যেত। চাকরি পাবার আনন্দেই ছিল। উঠেছিল সাহেববাজারের একটা মেসে। এখানকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দেখে এই শহরেই বাড়ি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিজেদের তো কিছু হয়নি। সে অতিকষ্টে টাকা জমিয়ে শহরের বাইরে কৃষ্টমাটিতে দেড় কাঠা জমি কিনেছিল। তখনো এ-অঞ্চলে শহর বিস্তৃত হয়নি। সে মাটি কিনেছে জেনেই অফিসের বড়োবাবু একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল। হ্যাঁ, তখন তার বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে থাকলে অনেক দিন আগেই বিয়ে হয়ে যেত। শহরে থাকলেও হয়তো বাড়ির লোকেরা তার বিয়ে নিয়ে উঠেপড়ে লেগে পড়ত। কিন্তু তার বাবা মা কেউ ছিল না। বাবা একেবারে ছোটোবেলায় কী করে মারা গিয়েছিল তার মনে পড়ে না। তার বয়স যখন ছ-সাত বছর তাঁরা কলেরায় মারা গেল। সে পিসির কাছে মানুষ হল। সে পিসিও কিছুদিন হল গত হয়েছে। কাজেই তার বিয়ে দেওয়ার

কেউ ছিল না। ফলে অফিসের বড়োবাবু যখন সম্বন্ধ নিয়ে এল তখন তার ভালোই লেগেছিল। না করেনি।

বড়োবাবু বলেছিল, "তাহলে কবে দেখতে যাবি বল্? আমি ওদেরকে বলে রাখব।"

সে এবার লজ্জা পেয়েছিল। তাদের গ্রামে তখনো ছেলেরা মেয়ে বা মেয়েরা ছেলে দেখতে যেত না। বাড়ির গুরুজনরা বা পাড়াপ্রতিবেশীরা দেখে পছন্দ করত। বিয়ের আগে বরকনের দেখাই হত না। সেটা মনে রেখেই সে বলেছিল, "আমি যাব না। আপনারা দেখুন।"

"সে কিরে? বিয়ে করবি তুই, আর মেয়ে দেখব আমরা! সে-কাল আর আছে। তোকেই দেখতে হবে।"

"আমি যাব না। আপনারা দেখলেই হবে।"

"আমরা দেখলে না হয় তোর হবে, কিন্তু মেয়েও তো তোকে একবার দেখতে চাইতে পারে!"

"তাহলে মেয়েকে আসতে বলুন।"

"সমরেশদা! নীলকণ্ঠের কথা শোনো! বলে, মেয়েকে দেখতে আসতে বলুন। তাও বোধহয় একদিন হবে। এখনো হয়নি। কবে যাবি বল?"

সে কিছুতেই রাজি হয়নি। শেষে রফা হয়েছিল। সে বড়োবাবুর বাড়ি যাবে। বড়োবাবু মেয়েটিকে এনে রাখবে। সেখানেই দুজনের দেখা করিয়ে দেবে। তার মনে পড়ে, সে-ব্যাপারটা ছিল যেন অনেক বেশি রোমাণ্টিক। সে যেতে বড়োবাবুর বাড়ির লোকজন বসতে দিল। তারপর একটি মেয়ে চা নিয়ে এল। বড়োবাবু তাকে ইংগিতে বুঝিয়ে দিল, এটিই সে মেয়ে। সে শিহরীত বোধ করছিল। মেয়েটিকে তার বেশ সুশ্রীই মনে হয়েছিল। পরে সরমার কাছে জেনেছিল, সে সুন্দরী ছিল বলেই বাড়ির লোকজন একবার দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তাদের ধারণা, একবার দেখলেই পছন্দ হয়েও যাবে। হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে তো মেসে থাকে। বউকে তুলবে কোথায়? বড়বাবুই উদ্যোগ নিয়ে বাড়ি তৈরির লোন নিয়ে দিয়েছিল। সেই লোনের টাকাতে বাড়ি করেছিল। সরমা বউ হয়ে সেই বাড়িতে এসে উঠেছিল। তখন তার জীবনটা যেন খুব সুন্দর ছিল। বছর দেড়েক পরে সরমার কোলে তাদের বড় মেয়ে মলি এল। তারও বছর দুয়েক পরে পলি। সে আর কোনো সন্তান নিতে চায়নি। কিন্তু সরমা একটা ছেলে চাইছিল।

আর তার কাল হল। তৃতীয় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে হাসপাতালেই সরমার মৃত্যু হল।

সে আবার বড় একা হয়ে গেল। তার ওপর দুই মেয়ে। একটার বয়স দু'বছর, আরেকটার চার। তার অফিস যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল। বড়বাবুর পরামর্শ মতো সে বাড়ির কাজের মেয়েটির বেতন বাড়িয়ে দিল। সে অন্য বাড়িগুলির কাজ ছেড়ে দিয়ে মলি-পলিকে সারাদিন দেখতে লাগল। সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরলে তবে সে নিজের বাড়ি যেত। দিনের বেলা কোনো কাজ পড়লে দুই মেয়েকে নিয়েই যেতে হত।

এই করেই তার দুই মেয়ে বড় হল। বাড়িতে দেখার জন্য মা ছিল না বলে উড়নচণ্ডীই হল। পড়াশোনা তেমন হল না। গায়ের রং ও গড়ন ভালো ছিল বলে অনেক ছেলেবন্ধু জুটে গেল। মাঝে মাঝে তার বিরক্ত লাগত। তাই তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করার চেষ্টা করল। বড় মেয়ে মলি তার নিজের বর নিজেই নিয়ে এল। এক ছোকরা ডাক্তার, সমীর। তার হাসপাতালের কোয়ার্টারেই থাকে। তারা নাকি আগেই রেজিষ্ট্রি করে রেখেছে। বিয়ে করে কোয়ার্টারে উঠে গেল। দ্বিতীয় মেয়ে পলির বিয়ে হল কৃষ্ণনগর কালেক্টরির এক কেরানীর সঙ্গে। সম্বন্ধ করেই হল। পাত্রের নাম বলরাম। বিনয়ী, সুপুরুষ। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে একটু হাফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু খুব বেশি দিন নয়। বড়মেয়ে মলি এসে কেঁদে পড়ল, "বাবা, সমীরের চাকরি গেছে। কোয়ার্টার থেকেও বেরিয়ে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছে। এখন আমরা কোথায় যাব?"

মেয়ের কান্নায় তার মন গলে গিয়েছিল। সে বলল, "আমি থাকতে আবার কোথায় যাবি? এখানে এসে ওঠ্। কিন্তু চাকরি গেল কেন?"

মলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওরা বলছে, ও নাকি ডাক্তারী পাশ করেনি। জাল সার্টিফিকেট দিয়েছিল।"

সে পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, সমীর চাকরি কোনোদিনই করত না। মামার কোয়ার্টারে থাকত। মামা মারা গেলে কোয়ার্টার খালি করে দিতে বলেছিল। মলি স্বামীর পরামর্শ মতো নাটক করেছিল। তবে সেটা জানার আগে নাটকের অনেকটাই অভিনীত হয়ে গিয়েছিল।

তার বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টে সমীরের পা ভাঙল। মলি এসে কেঁদে পড়ল, "বাবা ওর নিজের কিছু নেই তো। তাই

প্রচণ্ড মন খারাপ। তার জন্যই অন্যমনস্ক হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করল। তুমি বাড়িটা ওর নামে লিখে দাও।”

তার মত ছিল না। কিন্তু মলি বারবার বলার পরে সে ছোটমেয়ে পলির সঙ্গে কথা বলল।

পলি বলল, “বাবা! আমাদের তো বাড়ি আছে। দিদি যখন বলছে তুমি ওদের লিখে দাও।”

সে আশা করেছিল, পলি বাধা দেবে। উলটে লিখে দিতে বলে তাকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিল। এরকম হবে জানলে পলির সঙ্গে এ-নিয়ে কথাই বলত না।

তার মৃত্যুর পর তো তার দুই মেয়েই সম্পত্তি বিষয়-আষয় পাবে। সে পলির অংশটা রেখে মলিকে অর্ধেকটা লিখে দিল। কিন্তু দিয়েই তার মনে অশান্তি হতে লাগল। সে মরে গেলে মলি তো বাকি অর্ধাংশ থেকে আবার অংশ পাবে। পলি বঞ্চিত হবে। সেটা ভারী অন্যায় হবে। সে বাকি অংশটা পলির নামে লিখে দিয়ে, পলির হাতে দলিলটা দিয়ে দিল।

পলি বলল, “বাবা, আমি তো জমি চাইনি। দলিলও রাখব না। ও তোমার কাছেই থাক।”

ফিরে এসে সে তার বাক্সের মধ্যেই দলিলটা রেখে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে তার আশ্চর্য লাগে। যে-বাড়িতে সে থাকে সে-বাড়ির জন্য সে-ই জমি কিনেছে, সে-ই বাড়ি করেছে। অথচ এখন সে-বাড়ির মালিক সে নয়।

৩

থানার সামনে গিয়ে নীলকণ্ঠ বুঝতে পারছিল না, এবার কী করতে হবে। একজন পুলিশ বন্দুক হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। নীলকণ্ঠকে আসতে দেখে তার কোনো ভাবান্তর হল না। ভয়ে ভয়ে দু'পা বাড়িয়ে দেখল, দুটো মানুষ সামনের ঘরে বসে কী সব লিখছে। নীলকণ্ঠ পায়ে পায়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। তাদের তাকে দেখার মতো ফুরসত নেই। নীলকণ্ঠ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, “মহাশয়!”

যে লোকটি একটি খাতা দেখে অন্য খাতায় লিখছিল, বলল, “বুঝেছি ডায়েরি লিখতে হবে। দেখছেন না, কাজ করছি? বসতে হবে।”

নীলকণ্ঠ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “না মানে, ডায়েরি নয়।”

"তাহলে?"

"ওসি সাহেব আমাকে আসতে বলেছেন।"

"তো তার কছে গেলেই তো পারেন।"

"উনি কোনদিকে বসেন?"

লোকটি হাঁক ছেড়ে ডাকল, "দফা, এই দফা! ইনাকে বড়বাবুর কাছে নিয়ে যা-তো।"

একজন মাঝবয়সী লোক এসে তাকে তার সঙ্গে আসতে ইশারা করল। ওদিকে গিয়ে একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে দিল। ঘরের সামনে লেখা ছিল, 'ভজহরি ভট্টাচার্য, ভারপ্রাপ্ত অফিসার।' নীলকণ্ঠের মনে হল, সত্যি একটু খুঁজে দেখলেই সে ঘরটা পেয়ে যেত। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হত না। সে দোলখাওয়া ছোটো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ঢুকে দেখল, একজন পেল্লাই ভুঁড়িওয়ালা লোক টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে টেলিফোনে কথা বলছে, "না স্যার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। আমি সব ঠিক করে দেব। এমন টাইট দেব, ..."

নীলকণ্ঠকে দেখে সে ইশারায় বসতে বলল। নীলকণ্ঠ একরাশ অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকল। টেলিফোন রেখে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি নীলকণ্ঠ মন্ডল?"

নীলকণ্ঠ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, "হ্যাঁ, স্যার।"

স্যার ড্রয়ার থেকে একটা দরখাস্ত বের করে তার হাতে দিল। বলল, "পড়ুন।"

নীলকণ্ঠ দরখাস্তটা হাতে নিয়েই দরখাস্তের নিচে দরখাস্তকারীর নাম দেখার চেষ্টা করল। দেখল তার মেয়ে মলির ভালো নাম সেখানে জ্বলজ্বল করছে। সে ভাবতেই পারেনি মলি তার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে। সে দরখাস্তটা নিয়ে পড়তে লাগল।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার, কোতোয়ালী থানা।

মহাশয়,

আমি শ্রীমতী সুষমা সরখেল, আমার স্বামী এবং পুত্রকন্যা নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকি। বাড়ির অর্ধাংশ আমার নিজের নামে। তার প্রমাণস্বরূপ জমির দলিলের কপি সঙ্গে দিলাম। কিন্তু আমার বাবা শ্রী নীলকণ্ঠ মন্ডলের অত্যাচারে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমার মা অনেকদিন আগে

মারা গেছেন। বাবা কাজের মেয়ে বিভাকে রক্ষিতা রেখেছেন। আমরা এর প্রতিবাদ করেছিলাম। তাতে তিনি আমাদের ওপর খড়্গহস্ত। আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করছেন। আমাদের বাড়িতে আমার বা আমার স্বামীর কোনো বন্ধুবান্ধব এলে তাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছেন। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। গত শুক্রবার আমাদের পারিবারিক বন্ধু নরেন ঘোষ আমাদের বাড়ি এলে তাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। এরফলে বন্ধুমহলে আমরা অত্যন্ত বিব্রত ও লজ্জিতবোধ করছি। আমাদের এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচান। না হলে আরও অঘটন ঘটতে পারে। শান্তিভঙ্গ ঘটতে পারে। ইতি,

সুষমা সরখেল।

নীলকণ্ঠ ভাবতে পারছিল না। তার নিজের মেয়ে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে দরখাস্ত করেছে। তাও আবার নরেন ঘোষের পক্ষ হয়ে। এই নরেন ঘোষই তাদের শেষ করে ছাড়বে। শেষ হতে আর আছেই-বা কী। মান গেছে। সম্ভ্রম গেছে। নরেন ঘোষ এসে যেন একদম যাদু করে নিয়েছে।

নরেন ঘোষের সঙ্গে সমীরের সম্পর্ক বহু দিনের। সমীর পাশ করা না হলেও হাতুড়ে ডাক্তার। নরেন অর্ডার সাপ্লায়ার। সমীরকে সে ওষুধ সরবরাহ করে। তাদের সম্পর্ক কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। সমীররা তার বাড়িতে উঠে আসার পর মাঝে মাঝে এ-বাড়িতেও আসত। কিন্তু স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টের পর বাড়াবাড়ি রকমের আসতে লাগল। সমীরকে ভর্তি করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াও মলিদের সবরকম দেখাশোনা সেই করছিল। কোনো কোনো দিন রাতে বাড়িতে থেকেও যাচ্ছিল। নীলকণ্ঠের সেটা ভালো লাগেনি। ভালো লাগেনি মলির ব্যবহারও। একদিন একটা আপত্তিজনক দৃশ্য তার চোখে পড়ে গিয়েছিল। আর সেদিনই সে মলিকে ডেকে বলে দিয়েছিল, নরেন যেন এ-বাড়িতে আর না ঢোকে। মলি তার মুখের সামনে কিছু বলেনি। তবে নরেনের আসা বন্ধ হয়নি। কাজের মেয়ের কথা যদি ঠিক হয়, সমীর পেথেড্রিনের নেশায় আসক্ত। নেশা হয় বলে পেথেড্রিন এখন ওষুধ হিসেবে নিষিদ্ধ। কিন্তু আর সব মাদকের মতোই চোরাবাজারে পাওয়া যায়। নরেন সমীরকে সে পেথেড্রিন জোগায়। ফলে সে নরেনের পোষা কুকুরের মতো হয়ে গেছে। ইঞ্জেকশান নিয়ে পড়ে থাকে। আর নরেন ...। নীলকণ্ঠ ভাবতে পারছিল না। তাই সমীরকে বলেও কোনো কাজ না হলে গত শুক্রবার সে

নিজেই নরেনকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তার জন্য তার নিজের মেয়ে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে দরখাস্ত দিয়েছে। তাও তবু মানা যায়। কিন্তু তার মেয়ে কাজের মেয়ের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কুৎসিত সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছে। মা মারা যাওয়ার পর এই মহিলার কোলে-পিঠে করে তাদের মানুষ করেছে। মানুষ এমন কৃতঘ্নও হয়? মহিলা একথা শুনলে কী ভাববে। মহিলার সামনে সে মুখ দেখাবে কী করে? নীলকণ্ঠ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলল, "পড়লেন তো। বলুন, এবার ব্যাপারটা কী?"

নীলকণ্ঠ বলল, "বাড়িটা আমার স্যার।"

"পুরোটাই ছিল। কিন্তু এখন অর্ধেকটা আপনি বড়মেয়ের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।"

"বিক্রি নয় স্যার। আমি ওর নামে লিখে দিয়েছি।"

"আপনার কথাও যদি মেনে নেওয়া যায়, এখন অর্ধেক বাড়ির মালিক আপনার বড়মেয়ে?"

নীলকণ্ঠ এর প্রতিবাদ করতে পারল না। শুধু নিজের অপত্য স্নেহের জন্য নিজেকে মনে মনে অভিসম্পাত দিল।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলে চলল, "কাজেই তার নিজের বাড়িতে কে আসবে, কে আসবে না, সে-ব্যাপারে আপনি ইন্টারফেয়ার করতে পারেন না।"

নীলকণ্ঠ এবারও কিছু বলতে পারল না। চুপ করে বসে থাকল।

অফিসার সুর পালটে জিজ্ঞেস করল, "আইনের কথা ছাড়ুন। আচ্ছা বলুন তো, আপনি নরেনবাবুকে ও-বাড়িতে আসতে দিতে চান না কেন?"

নীলকণ্ঠ আসল কারণটা কিছুতেই বলতে পারল না। বলল, "ওই নরেনকে নেশার জন্য পেথেড্রিন এনে দেয় স্যার।"

অফিসার ক্ষোভের সুরে বলল, "নরেনবাবু তো ডাক্তার। ডাক্তার যদি ওষুধ চায়, নরেনবাবুর কী দোষ?"

"না, পেথেড্রিন আর ওষুধ নয় স্যার। নেশা হয় বলে নিষিদ্ধ। বিক্রি করা অপরাধ।"

অফিসার অপরাধের ধারে-কাছে না গিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, "পেথেড্রিনে নেশা হয়, আপনি জানলেন কী করে?"

"আমি সরকারি হাসপাতাল থেকে রিটায়ার করেছি স্যার।"

"তা করুন। তার জন্য পেথেড্রিনে নেশা হয় আপনি জানতে পারেন। কিন্তু অন্যের বাড়িতে কারও আসা বন্ধ করতে পারেন না।"

"বাড়িটা আমার স্যার।"

"আগে ছিল। এখন অর্ধেকের মালিক আপনার মেয়ে। দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার মেয়ে আপনার নামে অভিযোগ করেছে। আপনি আমাদের একটা বণ্ড লিখে দিন যে, আপনি আর ওদের বাড়িতে কে আসল, না আসল, এ-নিয়ে ঝামেলা করবেন না। বা শান্তি ভঙ্গ করবেন না।"

প্রস্তাবটা নীলকণ্ঠের একদম পছন্দ হল না। সে চুপ করে বসে থাকল।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভজহরি ভট্টাচার্য একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি লিখে ফেলুন।" লেখার জন্য সে একটা পেনও এগিয়ে দিল।

নীলকণ্ঠ ভয়ে ভয়ে পেনটা নিয়েও কী ভাবতে লাগল।

অফিসার জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছেন? লিখে ফেলুন।"

নীলকণ্ঠ পেনটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "না আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি মুচলেকা দিতে পারব না।"

এ-কথা শুনে ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভজহরি ভট্টাচার্যের মেজাজ গরম হয়ে গেল। নীলকণ্ঠকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলতে লাগল, "ভালো কথা। ভেবেছিলাম বৃদ্ধ মানুষ। বণ্ডে ছেড়ে দেব। বলে, 'বণ্ড দেবে না।' লক-আপে যান। দুদিন থাকলেই বুঝবেন, কত ধানে কত চাল।" সে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। প্রহরি এলে বলল, "এটাকে নিয়ে গিয়ে লক-আপে ঢুকিয়ে দে। আর ছোটবাবুকে বল্, নরেনবাবুর কাছ থেকে একটা কমপ্লেন লিখিয়ে নিয়ে একটা কেস স্টার্ট করতে।"

প্রহরি ইশারায় নীলকণ্ঠকে তারে সঙ্গে আসতে বলল।

নীলকণ্ঠ অফিসারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার অপরাধ কী? আমাকে হাজতে পুরতে বলছেন কেন?"

"খানিকটা বলেছি। বাকিটা কোর্টে গেলেই জানতে পারবেন।" প্রহরির দিকে তাকিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি নিয়ে যা। না হলে এখানে ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করবে। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

প্রহরি এবার তাকে জোর করে নিয়ে গেল। হাজতের দরজা খুলে ভিতরে ঠেলে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

ভিতরে ইতিমধ্যেই দুজন কয়েদির পোশাক পরে বসে ছিল। ওদের

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "মহাশয়ের কত ধারা?"

অপমানে, দুঃখে নীলকণ্ঠের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না। দু'চোখ বেয়ে উষ্ণ জলের ধারা নেমে এল। সে দু'হাত দিয়ে চোখ মুছছিল। হঠাৎ দেখল, নরেন হাজতের সামনে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে বাইরের ঘরে যে-লোকটি খাতায় লিখছিল সে। সে গদগদভাবে নরেনকে বলছে, "আপনি যে বললেন, আমাদের বাথরুমটা সারিয়ে দেবেন। তো কবে সারাবেন?"

নরেন বলছে, "আর দুটো দিন সময় দিন। আমি বলেছি যখন নিশ্চয় সারিয়ে দেব। এখন বড়বাবুর সঙ্গে কাজটা সেরে নিই।" যাবার সময় হাজতের দিকে তাকিয়ে, নীলকণ্ঠকে সেখানে দেখে যেন একটা তৃপ্তির হাসি হাসল।

খানিকক্ষণ পরে প্রহরি এসে দরজা খুলে নীলকণ্ঠকে বলল, "বড়বাবু আপনাকে ছেড়ে দিতে বলল। আপনি বাড়ি চলে যান।"

নীলকণ্ঠের প্রতিবাদ করার মতো অবস্থা ছিল না। ধুতির খুট দিয়ে চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

প্রহরি তার হাত ধরে বাইরে বের করে দিল।

বিদ্ধস্থ নীলকণ্ঠ কোনোরকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল। যেন সে আর বেঁচে নেই। নিজের প্রেতাত্মাকে নিয়ে চলেছে সে। চারিদিকে কি ঘটছে কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। হঠাৎ পাশে একটা মোটরসাইকেল এসে থামল। মোটরসাইকেল থেকে নেমে নরেন অবজ্ঞার হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, "আঠা মরেছে? না এখনো কিছু বাকি আছে?"

নীলকণ্ঠের প্রচণ্ড খারাপ লাগল। মনে হল তাকে এক্ষুনি খুন করে ফেলে। সেদিন বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেছিল। আজ হাত উঠল না। থানা দানব যেন তার সব শক্তি শুষে নিয়েছে। সে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল।

নরেন আবার সামনে এসে বলল, "আপনার জামাইকে নেশা ধরিয়েছি বললেন। আপনার মেয়েকেও যে ধরিয়েছি সেটা তো বললেন না। লজ্জা করল?"

নীলকণ্ঠের মাথায় আগুন চড়ে গেল। সে আর সহ্য করতে পারল না। দু'হাত মুঠ করে নরেনের দিকে তেড়ে গেল। নরেন চটপট মোটর সাইকেল ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

৪

পরের দিন সকালে বিভা কাজ করতে এসে দেখল, বাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে সে ছুটে মলির কাছে গেল। তারা এসেও কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ফেলল। দেখা গেল, নীলকণ্ঠের মৃতদেহ ফ্যান থেকে ঝুলছে। জিভ বেরিয়ে গেছে। জিভ থেকে লালা গড়িয়ে গায়ে পড়েছে। ধুতি খুলে পড়ছে। তাড়াতাড়ি দড়ি কেটে লাশ নামানো হল।

লাশের পকেটে একটা কাগজ ছিল। মলি বের করে পড়তে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কাগজটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ওদিকে চলে গেল। আবার এসে বাক্সটা খুলল। দলিলটা পড়তে গিয়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল। দলিলটা নিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর ফিরে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিভা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

কেউ থানায় খবর দিয়ে থাকবে। থানার বড় দারোগাবাবু ভজহরি ভট্টাচার্য ছুটে এল। লাশের সুরতহাল করল। তন্নতন্ন করে ঘরের কোনো, টেবিলের ড্রয়ার খোঁজ করল। বিভাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নীলকণ্ঠবাবুর ঘরে আর কিছু কী ছিল?' বিভা কলের পুতুলের মতো বলল, "বাক্সে একটা দলিল ছিল।"

দারোগাবাবুর কোনো ভাবান্তর হল না। জিজ্ঞেস করল, "আর?"

"পকেটে একটা চিঠি ছিল।"

দারোগাবাবুর শরীরে যেন বিদ্যুতের ছ্যাঁকা লাগল। সে চমকে উঠল। গলা মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী হল?"

"মলি দিদিমনি তুলে রাখল।"

দারোগাবাবু মলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে কাগজটা হাতে দিয়ে বলল, "দেখুন তো এটা কী না।"

বিভা আরষ্টের মতো হাতে নিয়ে পড়তে লাগল।

পলি,

আমার পক্ষে আর সম্মান নিয়ে বাঁচা সম্ভব হল না। অসম্মানের আগে মৃত্যু হলেই ভালো হত। সেটা হল না।

জন্ম থেকেই আমি একজন দুর্ভাগ্যকবলিত মানুষ। মা-বাবার যে সাহচর্য মানুষ পায় তা থেকে আমি বঞ্চিত। তোর মাও অকালে আমাকে ছেড়ে

চলে গেল। আমি একাধারে তোদের মা ও বাপ হয়ে তোদের বড় করেছি। তবে মানুষ করতে পারিনি। মানুষ যেমন করে পাঁজরার হাড়কে আগলে রাখে আমি তেমনি করে আমার স্বল্প সঞ্চয় আগলে রেখে, তা দিয়ে সামান্য জমি কিনে দেনা করে এই বাড়ি করেছিলাম। সে-দেনা চাকরির শেষপর্যন্ত শোধ করতে হয়েছে। সেই বাড়ির অর্ধাংশ তোর দিদিকে লিখে দিয়েছি বলে নাকি এ-বাড়িতে আর আমার কথা চলবে না। এ-বাড়িতে শান্তিতে থাকার জন্য তাই আমার মেয়ে আমার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে। যার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কোনো অপরাধ না করেও হাজতবাস করতে হল। এরপর বেঁচে থেকে আর কী হবে?

বিভা মলিকে কোলে নিজের সন্তানের মতো করে মানুষ করেছে। তাকে জড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত মলি কী করে যে করতে পারল সেই জানে। তারপর এ-মুখ নিয়ে আমি আর বিভার সামনে দাঁড়াতে পারব না। ইঙ্গিতটা মনে পড়লেই ঘেন্নায় আমার বমি পাচ্ছে। তাই বিদায় নিলাম।

আমার বেঁচে থাকার আর দরকারও নেই। আমি থাকলে অযথা অশান্তি বাড়বে। আমার অসম্মানও বাড়বে। তার থেকে এই চলে যাওয়াই ভালো বলে মনে হল। আমার সন্তানেরা সুখে থাক। ইতি,

তোর হতভাগ্য বাবা।

"তাহলে এটাই?" ভজহরি এক ছোঁয়ে কাগজটা নিয়ে হাঁটা দিল। বিভা বাক রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নীলকণ্ঠের আত্মহত্যার জন্য তার নিজেকেই দায়ী মনে হল।

ফতোয়া

পাটিকাবাড়ির অচিনতলার ইদগা ময়দানে আজ বিরাট মজলিস। আশেপাশের সাত গ্রামের মানুষ ডাকা হয়েছে। সব শুনে ফতোয়া দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে পাটদিয়াড়ের বুজর্গ আলেম আবসার আলী দেওবন্দীকে।

আলেম আরবী কথা, অর্থ বিদ্বান। কিন্তু এ-অঞ্চলে যারা ইসলামী শাস্ত্র নিয়ে মাদ্রাসায় পড়ে একমাত্র তাদেরই আলেম বলে। তাই সিনিয়র মাদ্রাসার মাধ্যমিক সমতুল পরীক্ষার নাম আলেম। আবসার আলী অবশ্য শুধু আলেম পাশ করা আলেম নন। তিনি আলেম পাশ করার পর, ফাজেল, কামেল, এবং এম. এ. সমতুল এম. এম পাশ করার পরও দেওবন্দে গিয়ে ইসলামী শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার হওয়ার জন্য মুফ্‌তি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। অক্সফোর্ড থেকে পাস করে যেমন অক্সোন, কেম্‌ব্রিজ থেকে পাশ করে ক্যাণ্টাব, তেমনি দেওবন্দ থেকে পাশ করে দেওবন্দী। দেওবন্দী এসে সকলের সামনে, যেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন সেখানে, যে মিনারে দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়া হয় তার পাশে বিছানো গালিচার ওপর বসে আছেন। তাঁর চারপাশ আলো করে আছেন সাত গ্রামের সাত মোড়ল — পাটিকাবাড়ির লুৎফর রহমান, হাসানপুরের জয়নুদ্দিন সেখ, বসন্তপুরের নাদেরবক্স মণ্ডল, আমিনাবাদের পরেশ সেখ, কালুপুরের অধার সেখ, জোড়গাছার শমী মণ্ডল, এবং আজিমগোলার আবুল হায়ৎ বিশ্বাস। তারপর অন্যান্য লোক। যাদের ডাকা হয়েছিল, তারা তো এসেছেই; যাদের ডাকা হয়নি, তারাও এসে জড়ো হয়েছে। কোনো মেয়েকেই এই মজলিশে ডাকা হয়নি। তবু বেশ কজন মেয়ে বিল্লালের বাড়ি জড়ো হয়ে জমায়েতের এক পাশে বসে আছে।

আজ যে ব্যাপার নিয়ে মজলিশ ডাকা হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এ-অঞ্চলে এরকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। খবরের কাগজ কী রেডিও-টিভিতেও এরকম ঘটনার কথা কেউ আগে কোনোদিন জানতে পারেনি।

হাসানপুরের হারুন আর রশিদ পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল না। টেনেটুনে মাধ্যমিক পর্যন্ত গেলেও, মাধ্যমিকে বার তিনেক ফেল করে। যারা পরীক্ষার খাতা দেখে তাদের অযোগ্যতার প্রতিবাদস্বরূপ সে পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা হাববিবুরের মতোই তার শরীর ছিল ছিপছিপে লম্বাটে। ততদিনে সে ছ ফুটের মতো লম্বা হয়েছিল। শরীরের কাঠামোও ছিল মজবুত। সেবার ভুবনপুরে সেনাবাহিনী লোক নিয়োগ করতে এল। হারুন লাইন দিল। হাজার লোকের মাঝে থেকে তারা হারুনকে বেছে নিল। হাসানপুর গ্রামে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেনাবাহিনীর কথা তারা শুনেছে। কিন্তু তাদের ঘরের ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে, দেশের হয়ে যুদ্ধ করবে, এমন কথা কেউ কোনোদিন ভাবেইনি। হারুন সেটা করে দেখিয়েছে। তার ওপর সে মাসে মাসে নগদ টাকায় বেতন পাবে। রাতারাতি সে ভালো পাত্র হয়ে গেল। অনেক জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। পাটিকাবাড়ির জারমান সেখের কন্যা জরিনাকে তার পছন্দ ছিল। তারা একইসঙ্গে লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলে যেত। ছাতার নিচে জরিনার গালের লাল আভা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। সে আভা এসে সোজা হারুনের বুকের বাঁদিকটাতে ঢুকে পড়ত। ষোল-সতের বছরের জরিনা তখন ক্লাশ এইটে পড়ত। হারুনের বাবার প্রস্তাব জরিনার বাবা মেনে নিল। খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। অষ্টমঙ্গলা সেরেই হারুনকে ট্রেনিঙে জয়েন করতে হল। ট্রেনিঙের পর কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এল। তারপরে কাশ্মীরে পোস্টিং হয়ে গেল।

মাসের-পর-মাস কেটে যায়। হারুনের দেখা নেই। মাঝে মাঝে শুধু দুয়েকটা চিঠি আসে। তাতে তার মনের আগুন আরও দ্বিগুণ হয়। কিছুদিন পর তাও আসা বন্ধ হল। তার চিঠিরও কোনো উত্তর এল না। তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে একদিন বাবাকে নিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে গেল। সেখানে খোঁজখবর নিয়ে যা জানল, তাতে জরিনার পাথর হয়ে যাবার অবস্থা। অফিসার জানাল, হারুন ছুটি চাচ্ছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য ছুটি দেওয়া হয়নি। ফলে, মাস তিনেক হল, হারুন অস্ত্র সমেত কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। হারুনের বাড়ির লোকেরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। তারা এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করছিল। কাশ্মীরেও গিয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। একদিন বাড়িতে চিঠি এল, হারুন 'ডেজার্টার'।

জরিনা দু'চোখে শুধু অন্ধকার দেখল। যে কোনোদিন নেশা ধরেনি, তার

কথা আলাদা। কিন্তু যে একবার নেশার স্বাদ পেয়েছে, তার পক্ষে নেশা না করে না থাকা হাতে আগুন ধরে রাখার মতো শক্ত। তার বয়স এখন আঠার। শরীরে, মনে ভরপুর কামনা। শরীর-মন দুইই পুরুষ সঙ্গ চায়। অথচ তার স্বামী পলাতক। কোথায় আছে, আদৌ আছে কী নেই, সে জানেনা। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করে না। বাবার বাড়ির লোকেরা একটা বোঝার মতো একটা অলক্ষুণে অভিশাপ মনে করে। তাদের কারও ব্যবহার আর যথেষ্ট আন্তরিক মনে হয় না। বিরক্ত হয়ে জরিনা আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করল। মাধ্যমিক পাশ করে আজিমগোলা হাই স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হল।

পাড়ার রকিব সেখ তার করুণ জীবন দেখে, না হারুনের মতোই তার গালের লাল আভা দেখে, তার প্রতি দুর্বল হয়ে গেল, বলা মুশকিল। সে একদিন জরিনার সঙ্গে পড়ে তার বোন সাহেদার মাধ্যম জরিনাকে প্রস্তাব পাঠাল। প্রথমে জরিনা একদম ঝেড়ে ফেলেছিল, "তাই আবার হয় নাকী? আমি বিবাহিতা। বিবাহিতা মেয়ের স্বামী বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে হয় নাকী?"

"তোর স্বামী বেঁচে থাকলে এতদিন আসত না?"

"মারা গিয়েছে, তাতো ওরা বলেনি। বলেছে 'ডেজার্টার'। ডেজার্টার মানে তো পলাতক।"

"ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখ গা, বেঁচে থাকলে এতদিনও আসত না?"

জরিনারও তাই মনে হয়। বেঁচে থাকলে, প্রকাশ্যে না হলেও লুকিয়েচুরিয়ে আসত। কী হল লোকটার? আস্ত একটা লোক গায়েব হয়ে গেল। বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করল, "কী করে খোঁজ করা যায়, বল্ দেখি?"

"খোঁজ করার কী আছে?"

"তাহলে কী করব?"

"তোর কেউ খোঁজ নিচ্ছে? তুই বিয়ে করে নে।"

"নারে। আমি তা পারব না।"

"তাহলে, কী করবি? সারাজীবন এরকম একদম একা থাকবি?"

জরিনা চমকে উঠল। সে যে খুব কঠিন কাজ। নিজের সঙ্গে নিজে সব সময় যুদ্ধ করা। এই চার বছরেই সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সে আর পারছে না। সে সত্যি এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়।

বান্ধবী বলে চলল, "এখন তো তাও তোর আব্বা বেঁচে আছেন। তিনি মারা গেলে কার কাছে থাকবি? পাঁচ কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে না?"

জরিনা ভাবী ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। ভীত হয়ে বান্ধবীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। মোল্লা ডেকে, কলেমা পড়িয়ে 'ইজাব-কবুল' করে দ্বিতীয়বার তার বিয়ে হয়ে গেল।

রকিব বাড়ির কাছেই মুদিখানার একটা ছোট্ট দোকান চালাত। তাতে যা লাভ হত কোনোরকমে চলে যেত। তাহলেও জরিনার শূন্য জীবন তার উপস্থিতি আর ভালবাসা দিয়ে ভরে দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর কী সম্পর্ক, তা জরিনা রকিবের সঙ্গে তার বিয়ে হবার পরই বুঝতে পেরেছিল। রকিব সকালে-বিকেলে তার সঙ্গে খুনসুঁটি করত। দোকানের কাজের মাঝে একটু ফাঁক পেলেই এসে জরিনাকে উত্যক্ত করত। জরিনা মুখে তিরস্কার করলেও মনে মনে খুশিই হত। সব মিলিয়ে সে খুশি ছিল। আরও খুশি হয়েছিল সেদিন, যেদিন বুঝেছিল, সে মা হতে যাচ্ছে। কিন্তু কদিন না যেতেই তা বিভীষিকা হয়ে উঠল।

কাগজে বড়ো বড়ো করে খবর বের হল, হারুন পাকিস্তানের জেলে বেঁচে ছিল। দু'দেশের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার তাকে , আরও কয়েকজনের সাথে, ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। দুদিন পরেই হারুন পাটিকাবাড়ি এসে হাজির হল। জরিনার মাথায় ইতিমধ্যেই আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এবার বজ্রপাত নেমে এল। হারুন তাকে স্ত্রীরূপে দাবি করল। রকিবও হাল ছেড়ে দিতে রাজি হল না। সে জরিনার সন্তানের বাবা হতে চলেছে। জরিনা তার। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন সব লোকের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রথমত, হারুন এবং রকিবের মধ্যে কার সঙ্গে জরিনার থাকা উচিত? যদি রকিবের সঙ্গে থাকে, তাহলে, হারুনের সঙ্গে বিয়ের কী হবে? যদি হারুনের কাছে ফিরে যায়, তবে রকিবের সঙ্গে বিয়ের কী হবে? জরিনার গর্ভে রকিবের সন্তানের কী হবে? সে কার কাছে থাকবে?

হারুন পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে 'হিরো' হয়ে এসেছিল। সে কোনোমতেই 'জিরো' হতে চায় না। সে বলল, "আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরে রেখেছিল। কাজেই জরিনা আমার কাছে আসবে।"

"বাচ্চাটার কী হবে?"

"যার বাচ্চা, তার কাছে থাকবে।"

লোকের মুখে সে-কথা শুনে জরিনা বলেছিল, "ঠিকই তো। আমার বাচ্চা আমার কাছে থাকবে।"

সঙ্গে সঙ্গে রকিব যোগ করেছিল, "আমার বাচ্চা আমার কাছে থাকবে। আমার বাচ্চার মাও আমার কাছে থাকবে।"

হারুন 'হিরো'র মতো ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হল না। সে মেয়েকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জরিনার বাবার ওপর চাপ দিতে লাগল। কয়েকবার এ-নিয়ে মজলিশ বসেছে। কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই, সবার সঙ্গে পরামর্শ করে, হারুনের বাবা আজ সাত গ্রামের মানুষ ডেকেছে। এরকম মানুষ ডাকা এখানে অনেক বছর পর বড় কোনো সমস্যা হলে পরেই ডাকা হয়। সে-সভায় বিচার ইসলামী আইন অনুসারেই হয়, কিন্তু ভারতের পুরানো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

সবাই এসে গিয়েছিল। এবার কাজ শুরু করতে হয়। দেওবন্দী মোড়লদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। নাদেরবক্স বললেন, "তাহলে হাবিবুরকে জিজ্ঞেস করা হোক, কেন সে আমাদের ডেকেছে।" এইটাই এই অঞ্চলের নিয়ম। যে কোনো বিচার সভায়, যে মানুষ ডাকে, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা যে রায় দেবে তা মেনে নেবে কি না? জয়নুদ্দিনের বাড়ি হারুনের বাবার সঙ্গে একই গ্রামে হওয়ায়, তাঁরই ওপর জিজ্ঞেস করার ভার পড়ল।

জয়নুদ্দিন বলল, "কই গো হাবিবুর? তুমি আমাদের কেন ডাক্‌ল্যা, বলো।"

হাবিবুর উঠে দাঁড়িয়ে সব কথা বিবৃত করল। তাঁরপর হাত জোড় করে বলল, "আপনারা ইয়ার একটা ফায়শালা করে দ্যান।"

"ফায়শালা যদি তোমার বিরুদ্ধে যায়, তুমি মাইনে লিবা তো?"

হাবিবুর ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল, "হাঁ।"

এবার দেওবন্দী পাটিকাবাড়ির লুৎফরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। লুৎফর প্রথমে রকিবের বাবা রমজানের দিকে তাকিয়ে বলল, "মজলিসের যা রায় হবে, তা তোরা মেনে নিবি তো?"

এত লোকের উপস্থিতিতে তাদের কথা মেনে নেবে না বলা বোধহয়

সম্ভব নয়। সে ঘাড় নেড়ে বলল, "নিশ্চয়।"

লুৎফর এবার জরিনার বাবা জারমানকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা?"

জরমানও হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল।

বিচারের কাজ শুরু হল। পরেশ সেখ প্রস্তাব দিলেন, "হাবিবুরের কথা তো শোনা হল। তাহলে অন্য পক্ষেরও বক্তব্য শোনা হোক।"

দেওবন্দীর ইঙ্গিত মতো লুৎফর আবার জারমানের দিকে চেয়ে বললেন, "জার্মানিভাই, আপনাদের কী বলার আছে বলুন।"

জারমান বলল, "আমার কিছু বলার আর কী থাকবে? আমার কিছু বলার নাই।"

লুৎফর এবার রমজানের দিকে তাকলে, "তোর কী বলার আছে, বল্।"

রমজান ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বোলবি, বল্।"

রকিব বিধ্বস্তের মতো উঠে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "জরিনার স্বামী অনেক বছর নিরুদ্দেশ ছিল। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও তার কোনোরকম খোঁজ নিত না। এরকম অবস্থায় তার সম্পূর্ণ স্বমতে আমি শাস্ত্র অনুস্যারে ধর্মের নিয়ম মেনে বিয়ে করেছি। জরিনা আমার সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় জরিনা যাতে আমার সঙ্গেই থাকতে পারে, আপনারা সেটা দেখুন।"

দেওবন্দী বললেন, "যদি আর কারও কিছু বলার থাকে বলতে পারেন।"

আবুল হায়ৎ আরও একটু জোরে বললেন, "আপনাদের আর কারোর যদি কিছু বলার থাকে, যাতে এই ফয়শালায় সুবিধা হবে, তাহলে বলুন।"

বলার জন্য কেউ এগিয়ে এল না।

দেওবন্দী বললেন, "রায় কী দেওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে যদি কেউ কোনো মত দিতে চান, বলুন।"

শমী মন্ডল উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মত বলুন।"

এবার লোক মতামত দিতে লাগল। কেউ বলল, জরিনার রকিবের সঙ্গেই থাকাই উচিত। কেউ বলল, হারুনের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। তবে বাচ্চাটা রকিবকে দেওয়া উচিত। কেউ বলল, না, বাচ্চা মায়ের কাছেই থাকা উচিত।

উপস্থিত লোকেরা কোনো ঐক্যমতে পৌঁছুতে পারল না।

তখন দেওবন্দী মোড়লদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

অনেক শলাপরামর্শ করে রায় দিলেন।

অধার সেখ দেওবন্দীর হয়ে সে রায় ঘোষণা করলেন :

হারুন আর জরিনার বিয়ে হয়েছিল ইসলামী শরিয়ৎ অনুসারে। ইসলামী ফিকাহ্ অনুসারে, স্বামী একমাত্র তালাক দিতে পারে। স্ত্রীর তালাক দেওয়ার কোনো অধিকার স্বীকৃত নাই। হারুন তালাক দেয়নি। আদালতের কোনও রায় অনুসারেও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাজেই তাদের বিয়ে এখনো অটুট আছে। আবার ইসলামী আইন অনুসারে একজন পুরুষকে এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হলেও নারীকে এক স্বামী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। কাজেই রকিবের সঙ্গে জরিনার বিয়ে জায়েজ নয়। কাজেই জরিনাকে হারুনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

হারুনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রকিব মুহ্যমান হয়ে মুখ নিচু করল।

ঘোষণা শেষ করে অধার শেখ বসতেই লোকেদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, "পেটের বাচ্চার কী হবে?"

দেওবন্দী বললেন, "বাচ্চার বাবা হিসেবে, নাজায়েজ বাচ্চা রকিব পাবে।"

তার কথা শেষ না হতেই বিল্লালের বাড়ির দিক থেকে একটি মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মৌলভী সাহেব!"

সবাই ওদিকে ফিরে তাকাল। কেউ উচ্চারণ করল, "জরিনা।"

জরিনা বলল, "মৌলভী সাহেব! আপনি তো আমাকে কী করতে হবে, সে রায় দিয়ে দিলেন। দেওয়ার আগে, আমি কী চাই, আমার কোনো বক্তব্য আছে কী না, একবার জিজ্ঞেসও করলেন না।"

তার কথায় দেওবন্দী সমেত সভার সকলে চমকে উঠল। জরিনা লুৎফরের গ্রামের মেয়ে। মজলিশও তারই গ্রামে। কাজেই তাঁর খারাপ লাগল সব থেকে বেশি। তিনি কর্কশ কণ্ঠস্বরে বললেন, "তোকে এখানে বেশরমের মতো, বেপর্দা হয়ে, পুরুষ মানুষের মজলিশে আসতে কে বলেছে? না লায়েক মেয়েছেলে কোথাকার!"

জরিনা তিরস্কারকে পাত্তা না দিয়ে বলল, "লুৎফরচাচা! বেপর্দা বলছেন কেন? ইসলামে পুরুষ ও নারীর যে আলাদা ধরনের বাধ্যতামূলক পোশাকের

কথা বলা হয়েছে, তা ন্যায্য কী না, সে তর্কে না গিয়েও বলছি, ইসলাম ধর্মে যে পোশাক পরতে বলা হয়েছে, আমার পোশাকে তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। মেয়েদের মুখ আর পাায়ের পাতা ছাড়া অন্য সব জায়গা আবৃত করতে বলা হয়েছে। মুখ আবৃত করে রাখতে কোথাও বলা হয়নি। আর পুরুষের মজলিশে আসার কথা বলছেন? মেয়েরা হজরত মহম্মদের সঙ্গে মজলিশে বসত, জামাতে নামাজ পড়ত। তাহলে তা আপনাদের কাছে আপত্তিজনক হচ্ছে কেন? আমরা মেয়েরা এবার এই ঈদগায়ে ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে আসব। দেখি, আপনারা কী করে বন্ধ করেন?''

তার কথা শুনে সারা মজলিশ চুপ করে গেল। নাদেরবক্স দেওবন্দীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''মৌলভী সাহেব! মেয়েটি কী ঠিক বলছে?''

দেওবন্দী বলল, ''ঠিকই বলছে।''

জয়নুদ্দিন বললেন, ''কীরকম ঠিক?''

ইসলামে মেয়েদের মুখ ও পায়ের পাতা ছাড়া শরীরের অন্য জায়গা আবৃত রাখতে বলা হয়েছে। মুখ আবৃত করতে বলা হয়নি। কাজেই সে যে পোশাক পরে আছে, তা ইসলামী মতেও ঠিকই আছে। আর মেয়েরা পুরুষদের জমায়েতে আসতে পারবে না, এরকম কথা হাদিস-কোরানে কোথাও নেই। আমাদের নবী করিম সাল্লুল্লাহে আলায়হেস্‌সাল্লাম যখন মদিনায় প্রথম মসজিদ স্থাপন করেন তখন মেয়েরাও তাঁর সঙ্গে জমাতে নামাজ পড়ত।''

নাদেরবক্স জানতে চাইল, ''তাহলে পরে তাদেরকে বাদ দেওয়া হল কেন?''

''বাদ দেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি না। তবে দেখি, আর মেয়েরা জামাতে আসে না।''

জরিনা বলে চলছিল, ''১৯৩৯ সালে এদেশে 'ডিসুলিশন অফ মুসলিম ম্যারেজেস অ্যাক্ট' বলে একটা আইন পাশ হয়েছে। সেই আইন অনুসারে, আটটি কারণে, স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইতে পারে। প্রথম কারণ, চার বছর স্বামীর কোনো খোঁজ না পাওয়া। দ্বিতীয় কারণ, যে কোনো কারণেই হোক, দু'বছর স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণ না করা। তৃতীয় কারণ, স্বামীর সাত বছর জেল হওয়া। হারুন নিখোঁজ হওয়ার পর আজ কতদিন হয়েছে? হারুন বা তার আত্মীয়স্বজন, যাঁরা আজ আপনাদের ডেকে এনেছে, তাঁরা আমার

ভরণপোষণের জন্য কী ব্যবস্থা করেছিল? যদি না করে, তবে আজ এ-সব করার জন্য তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত কি না?"

দেওবন্দী কিছু বলতে পারল না।

নাদেরবক্স আবার জানতে চাইল, "মেয়েটি যে-রকম বলছে, সে-রকম আইন সত্যি কি আছে?"

দেওবন্দী অসহায়ের মতো ঘাড় নেড়ে জানালেন. "আছে।"

"তাহলে তো মেয়েটার কথা না শোনা অন্যায় হয়েছে।"

হারুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে একদম আটকে রেখেছিল। আমার কী করার ছিল?"

জরিনা সরাসরি উত্তর দিল, "সেনাবাহিনী লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, পলাতক। আমার কী করার ছিল? ফিরে এসেও আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল। তা না করে জোর করে আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল। আমার দ্বিতীয় স্বামীর এবং আমার বাবার ওপর চাপ দেওয়া হল। আমি কী ভেড়ার বাচ্চা না কী? তাদের যার কাছে খুশি আমাকে পাঠিয়ে দেবে?"

জরিনার বাবা জারমান উঠে দাঁড়াল। বলল, "জরি, তুই একটু ভদ্রভাবে কথা বল্।"

জরিনা বলে চলল, "মৌলভী সাহেব! আপনি ফতোয়া দিয়েছেন, আমাকে হারুনের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু আমি এখনই বলে দিচ্ছি, আমি যাব না। আপনারা যা হয়, এখনই বিচার করে যান। তবে আমি আবারও বলছি, মেয়ের সম্মতি ছাড়া মুসলমানেদের বিয়ে হয় না। যার বিয়ে করার জন্য সম্মতি নিতে হয়, তার বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্যও সম্মতি থাকা চাই।"

জয়নুদ্দিন দেওবন্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, "কী বলছে, শুনেছেন?"

দেওবন্দী বললেন, "ঠিকই বলছে। নবী করিম সাল্লুল্লাহেস্‌সাল্লাম বলেছেন, কোনো বিয়েতে যদি মেয়ের ক্ষতি হচ্ছে, সে বিয়ে ভেঙে দাও।"

"যদি অত সব বলেছেন, তাহলে আমরা ওরকম ফতোয়া দিলাম কেন?"

দেওবন্দী মুখ বন্ধ করে থাকল।

জয়নুদ্দিন উঠে জানতে চাইল, "তাহলে কি, মা, তুই রকিবের সঙ্গেই থাকবি?"

"না।"

"তাহলে?"

"আমি একাই থাকব।"

"কিন্তু তোর নাজায়েজ বাচ্চার কী হবে?"

"বাচ্চা তার মায়ের কাছে থাকবে। আর জয়নুদ্দি চাচা, যে কোনো বাচ্চাই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। যে বাচ্চা এখনই জন্মায়ইনি, সে দোষ করতে পারে না। সে নাজায়েজ হতে যাবে কেন? আমাদের কোনো কাজ নাজায়েজ, অর্থাৎ অবৈধ হতে পারে। তার জন্য বাচ্চা দায়ী নয়। বাচ্চা নিষ্পাপ। "

গোটা মজলিশ চুপ করে থাকল। কী করা উচিত ভাবতে লাগল।

দুর্নীতি

সি. বি. আই-এর 'অ্যান্টি কোরাপশান সেল'-এর এস. পি, বকুল বিশ্বাস উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল। ডি. এস. পি, বাঁধন চক্রবর্তী ফোন করে জানাল, "স্যার, ট্র্যাপ সেণ্ট পার্সেণ্ট সাকসেসফুল হয়েছে। চেম্বারে এখন সিজার চলছে। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাব।"

ফোন রেখে সে ভাবার চেষ্টা করছিল, 'সেণ্ট পার্সেণ্ট সাকসেসফুল! চেম্বারে সিজার চলছে!' তার মানে কথা মতো চেম্বারে গিয়েই ঘুষ নিচ্ছিল। ভয়ডরের কোনো বালাই নেই! দুষ্কর্ম করার সাহস আছে বলতে হবে। বকুল ভেবে পায় না, এত সাহস কী করে হয়?

২

পরশুদিন বিকেলবেলায় সে দর্শনপ্রার্থীদের স্লিপগুলো দেখছিল। হঠাৎ দেখল, একটা স্লিপে 'প্রফেসর ড. অমিত চ্যাটার্জি, এস.এস.কে.এম হসপিটাল' লেখা। কদিন আগে তার বাল্যবন্ধু দেশের বাড়ি থেকে ফোন করেছিল, তার ছোটোবোনটার কঠিন ব্যাধি হয়েছে। জেলা-শহরের ডাক্তার পি. জি-র ড. অমিত চ্যাটার্জিকে দেখাতে বলেছেন। দু-তিন মাসের আগে তাঁর 'ডেট' পাওয়া যায় না। বকুল যদি তাকে একবার ফোন করে দেয়, তাহলে আগে পেতে পারে। বাল্যবন্ধুর মুখের ওপর না বলতে পারেনি। আবার অনুরোধ করতে তার ভালোও লাগে না। কাজেই ফোন করবে করবে করেও করা হয়নি। করবে ভাবছিল। সেই চিকিৎসক নিজে থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে সবার আগে ডেকে পাঠাল।

চিকিৎসক এসে সামনের চেয়ারে বসে বলল, "স্যার, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। তবে আপনাদের অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে।"

বকুল বলল, "আপনি নামকরা চিকিৎসক। সেটা খুবই স্বাভাবিক।"

"আপনাদের চক্রবর্তী সাহেব? আমাকে খুব ভালবাসেন। তারপর আপনাদের ডি. জি? ওনার স্ত্রী আমার পেশেন্ট তো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"ওই যে, আপনাদের খগেন বিশ্বাস, আমার ভাইয়ের বন্ধু তো। ..."

ইনিয়ে-বিনিয়ে কার কার সঙ্গে পরিচয় আছে তা শুনতে বকুলের ভালো লাগছিল না। এরকম বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক জাহির করে যারা 'ইম্প্রেস' করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য প্রায় সময়ই ভালো হয় না। বকুল বলল, "আমি আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন!"

"আপনার মতো সৎ-লোকই বদমাশকে সায়েস্তা করতে পারেন। সৎ-লোক তো আর বেশি নেই।"

"কেন? আপনি যাদের নাম বললেন, তারা কি অসৎ লোক?"

"সে তো আপনি আমার থেকে ভালো জানেন।"

"আপনার সঙ্গে সুসম্পর্ক, আপনারও অজানা থাকার কথা নয়। যাক সে-কথা, আপনার সমস্যাটা কী বলুন।"

"ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টার ঘুষ চাইছে। আমি চাই, তাকে হাতেনাতে ধরা হোক।"

"তা আপনার ছোটো ভাইয়ের বন্ধু খগেন বিশ্বাস তো এখন রাজধানীর পুলিশে আছে। তাকে বললেই তো হয়ে যেত।"

"গিয়েছিলাম। কিন্তু সে বলল, 'ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টার সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট স্টাফ। আমরা কি করব, সি. বি. আই-এর কাছে যেতে হবে।' সে আপনার কাছে আসতে বলল। বলল, 'খুব কড়া অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান হয়ে যাবে।' সেজন্যই ভরসা করে এলাম।"

বকুল 'প্রিভেন্শান অফ কোরাপ্শান অ্যাক্টটা নিয়ে আরেকবার দেখে নিল। না কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার ঘুষ নিলে, রাজ্যের পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না, এরকম কোনো বাধানিষেধ সেখানে নেই। শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, এ আইনের কোনো ধারায় মামলা তদন্ত করার জন্য একজন অফিসারকে নুন্যপক্ষে ডি. এস. পি/ এ. সি. পি পদমর্যাদার হতে হবে। সি. বি. আই-এর ক্ষেত্রে নুন্যপক্ষে ইন্সপেক্টার হলেই হবে। সে বলল, "না আইনে তো সে-রকম কিছু নেই যে, রাজ্যের পুলিশ করতে পারবে না।"

"তাহলে হয় তো এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু আপনারাও তো করতে

পারেন। ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টার সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এম্প্লয়ি হওয়ায় আপনারাও অ্যারেস্ট করে কেস করতে পারেন।"

"পারি।"

"তাহলে, আপনারা একটু তদন্ত করে দেখুন না।"

বকুল এ আবেদন অস্বীকার করেত পারল না। বলল, "বলুন।"

অমিত বলল, "কী বলব, বলুন?"

"আপনার কাছে টাকা কিভাবে চাইছে?"

"আমি তো চিকিৎসা নিয়েই থাকি। আমার হিসেবটা আমার সি. এ জমা দেয়। তাকে বলেছে, 'আমরা তো পেয়ে থাকি। আর সবাই যেমন দেয়, ডাক্তারবাবুকেও পঞ্চাশ হাজার দিতে হবে। না হলে খুঁত বের করে নোটিশ পাঠাব, এনকোয়ারি হবে। তারও বেশি খরচ হয়ে যাবে। মানসিক অশান্তিও হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বকুলের একটা ঘটনার কথা মনে পড়েছিল। সে তার নিজের আয়করের ফর্ম নিজে পূরণ করে জমা দেয়। স্বাভাবিকভাবে গরমিল হবার সম্ভাবনা নেই। তবুও গত বছর সে একটা নোটিশ পেল। আয়করের রিটার্নটা আরেকবার দেখে নিয়ে, অফিসের কাজের ফাঁকে নিজেই আয়কর অফিসে গেল। দেখল, তার অনার্সের সহপাঠী রবীন তার সার্কেলের আয়কর অফিসার। রবীন খুব হালকাভাবে বলল, "তুই অনেক টাকার এন. এস. সি দেখিয়েছিস। ওরা বুঝতে পারছে না, তুই এন. এস. সি-র ইন্টারেস্টটা যোগ করেছিস কি না।" বকুল সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বলেছিল, তার জন্য ডেকে পাঠাতে হবে? চিঠিতে ওটা পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলেই তো পারতিস। আমি জানিয়ে দিতাম।" রবীন বলল, "আবার কী একটা প্রশ্ন উঠত, আবার চিঠি লিখতে হত। তার থেকে চলে এসেছিস। কথাবার্তায় সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোর সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। এমনি ডাকলে তো আসতিস না।" কথাটা রবীন হাসতে হাসতেই বলেছিল। কিন্তু বকুলের ভালো লাগেনি। মনে হয়েছিল, রবীন যেন তার ক্ষমতা দেখানোর জন্যই একটা ছুতো তুলে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তারও থেকে আরও খারাপ লেগেছিল যখন রবীনের অফিস থেকে বের হতেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পিয়ন পিছন পিছন এসে হাত পেতে বলেছিল, "সাব বখশিশ।" বকুলের মাথায় জ্বালা ধরে গিয়েছিল। কারণ সে ইউনিফর্ম পরে ছিল। তা

থেকে পিয়ন অবশ্যই বুঝতে পেরে থাকবে যে, সে পুলিশের লোক, যাদের কাজ দুর্নীতি বন্ধ করা এবং কেউ দুর্নীতি করলে তাদের ধরা। অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে, তাদের কাছেও লোকে ঘুষ চাইতে পারে। সেটাকে কোনো অন্যায় কাজ মনে করে না। বলেছিল, "সরকারি কাজ করেন। সরকারি ইউনিফর্ম পরে পথের ভিখারীর মতো হাত পাততে লজ্জা লাগে না!" তাতে সে বিন্দুমাত্র না দমে বলেছিল, "কী করব স্যার, ঘরের ভিতরে আপনারা যে টাকা দেন, তার তো আমি হিসাব পাই না। আর হাত না পাতলে কেউ দেয়ও না।" অর্থাৎ ভিতরে যেমন ঘুষ দেন, বাইরেও কিছু দিতে হবে। বকুল বলেছিল, "আমার পোশাক দেখে অন্তত মনে হচ্ছে যে, আমি পুলিশে কাজ করি। আমার কাজ কেউ ঘুষ চাইলে তাকে হাজতে ঢোকানো। চলুন, আপনাকেও ঢোকাতে হবে।" এবার সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "মাফ কর্ দিজিয়ে সাব। মুঝে বখশিশ নেহি চাহিয়ে।" তার এরকম কাকুতি-মিনতি শুনে লোক জমে গিয়েছিল। রবীনও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল। বকুল চলে এসেছিল। কিন্তু তার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এ কোন অবস্থার মধ্যে তারা বাস করছে! সৎভাবে বাঁচতে পারবে না। অফিসে ফিরেও সে অনেকক্ষণ কাজ করতে পারেনি।

কদিন আগেই আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। সে তার বাড়ির পরিকল্পনা কর্পোরেশানে জমা দিয়েছে। সে অন্য পথে না গিয়ে নিজে কর্পোরেশানের অফিসে গিয়ে কথা বলে, কী কী করতে হবে সেটা জেনে তার নিযুক্ত আর্কিটেক্টকে নিয়ে গিয়ে কথা বলিয়ে দিয়েছে। তারপরেও যখন কাল সেই আর্কিটেক্টের লোক অফিসে পরিকল্পনাটা জমা দিতে গিয়েছে, তখন অফিসের লোক পরিকল্পনাটা জমা নিয়ে একজন মহিলা কর্মচারীকে দেখিয়ে বলেছে, "ইনি আপনাদের ফাইলটা রোড্‌সের অফিসে নিয়ে যাবেন।" সে মহিলা কর্মচারী তাকে সকলের সামনেই বলেছে, "আমি তো বাসে করে যাব, বাসভাড়াটা দিয়ে যান।" আর্কিটেক্টের লোক তাকে যা বলেছে, সে এটা স্বাভাবিক নিয়ম ভেবে জিজ্ঞেস করেছে, "কত?" মহিলা কর্মচারী উত্তর দিয়েছে, "পঞ্চাশ টাকা।" সে পঞ্চাশ টাকা সেই মহিলা কর্মচারীকে দিয়ে এসেছে। বকুল জিজ্ঞেস করেছিল, "ওই টাকার জন্যও কোনো রসিদ দিয়েছে?" আর্কিটেক্ট উত্তর দিয়েছিল, "না।" বকুল বুঝতে পেরেছে, ওটা

ঘুষ। অর্থাৎ সে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ঘোর বিরোধী হলেও তার কাজ করতে গিয়ে আর্কিটেক্ট অফিসের লোককে ঘুষ দিতে হয়েছে। তার কাজ জেনেও কর্পোরেশনের লোক তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছে। সৎভাবে বাঁচতে চাওয়া এতটাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বকুলের খুবই খারাপ লেগেছে। আর্কিটেক্টকে বলেছে, "ওই লোককে আমার কাজ দিয়ে আর পাঠাবেন না। আর সোজাসুজি কাজ করতে আপনাদের অসুবিধা হলে, বলুন, আমি নিজে আবার যাব।" আর্কিটেক্ট তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাতে তার মনের ক্ষোভ দূর হয়নি। চিকিৎসকের কথাটা তাই তাকে স্পর্শ করে গেল।

অমিত বলে চলল, "কিন্তু আমি এ-রকমভাবে ঘুষ দেওয়ার ঘোর বিরোধী। এ অন্যায়ের একটা বিহিত হওয়া দরকার। সেজন্য আপনার কাছে এসেছি।"

বকুলের খুব ভালো লাগল। যাক, অন্তত কিছু লোক আছে, যারা তার মতো ঘুষ নেওয়া-দেওয়ার বিরুদ্ধে। এরকম লোককে সে নিশ্চয় সাহায্য করবে। বলল, 'ইনকাম ট্যাক্সের যে ইন্সপেক্টার ঘুষ চাইছে, তার যাতে সাজা হয়, আমি নিশ্চয় সে চেষ্টা করব। কিন্তু সাজা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হতে হবে। তার জন্য তাঁকে হাতেনাতে ধরতে হবে।"

"আপনি লোক দিলেই আমি হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে পারব।"

"কবে, কখন, কোথায় লোক দেব? সবসময় তো আপনার কাছে লোক দেওয়া যাবে না। আর গেলেও তা গোপন থাকবে না। তার জন্য সুবিধা মতো একটা জায়গায় টাকা নিতে আসার সময় ঠিক করতে হবে।"

"সুবিধাজনক জায়গা বলতে আপনি কী বলছেন?"

"যেখানে তাকে ধরার জন্য আমাদের লোকের আত্মগোপন করে থাকতে সুবিধা হবে এবং টাকা নেওয়া-দেওয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সিগন্যাল দিলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করতে পারবে।"

"সিগন্যাল মানে?"

"সিগন্যাল না দিলে, ওৎ পেতে থাকা আমাদের লোকেরা এবং নিরপেক্ষ সাক্ষীরা বুঝবে কী করে যে, টাকা লেনদেন হয়েছে। ওরা তো আপনার সঙ্গে থাকতে পারবে না। আপনার সঙ্গে লোক থাকলে সে ঘুষ নাও নিতে পারে।"

"তা ঠিক। তাহলে কোথায় আপনার লোকদের আত্মগোপন করে থাকতে সুবিধা হবে?"

"আপনার চেম্বারে হলে সব থেকে ভালো হয়। রোগী হয়ে খুব সহজেই থেকে যেতে পারে। পি. জি. হাসপাতালেও হতে পারে। না রাজি হলে কোনো পার্কে বা রেলস্টেশানে বা বাসস্টপের কাছে, যেখানে কয়েকজন লোক থেকে গেলে কারও চোখে পড়বে না। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ওর বাড়িতে বা অফিসে রাজি হবেন না। ও অন্য কোথাও কোনো মতে রাজি না হলে তবে অফিসে বা বাড়িতে রাজি হবেন। বাড়িতে সবশেষে।"

"তাহলে, আমাকে এখন কী করতে হবে?"

"আপনাকে প্রথমে গিয়ে ইন্সপেক্টার ঘুষটা কবে কখন কোথায় নিতে আসছে সেটা ঠিক করে ফেলা এবং ঠিক হলেই আমাদের কাছে এসে একটা লিখিত অভিযোগ করা। অভিযোগ পেলেই আমি আমার লোকদের দিয়ে ট্র্যাপ করে হাতেনাতে ধরব। সময়টা রাতে না হয়ে দিনের বেলায় হলেই সুবিধা হয়।"

পরের দিন সকালেই অমিত চ্যাটার্জি তার সি. এ. স্বপন সমাদ্দারকে নিয়ে এল। স্বপন বলল, "স্যার কাল সকালে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এসেই টাকা নিতে রাজি হয়েছে।"

বকুল জানতে চাইল, "ইন্সপেক্টারের নাম কী?"

"তপন টিকাদার স্যার।"

"দেখতে কেমন? কোনও ছবি আছে?"

"না স্যার। তবে, আমি দেখিয়ে দিতে পারব।"

"তাতে সন্দেহ করতে পারে। ট্র্যাপ সাকসেসফুল নাও হতে পারে না। তার থেকে যারা ট্র্যাপ করতে যাবে তারা বরং আপনার কোনো সিগন্যাল থেকে বুঝে নেবে।"

বকুল বেল বাজিয়ে ইন্সপেক্টার চানক্য দত্তকে ডেকে পাঠাল। চানক্য এলে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে 'কেস স্টার্ট' করার জন্য অমিত এবং স্বপনকে তার সঙ্গে দিয়ে দিল। বলল, 'ট্র্যাপ করার জন্য কাকে কাকে সঙ্গে নেবেন, সাক্ষী কাদের রাখবেন, তা আপনিই ঠিক করবেন। আমি শুধু আপনাদের ট্র্যাপের অপারেশানের আগে ডি. এস. পি. বাঁদন চক্রবর্তী এসে গেলে কেসটা দেখতে বলব।"

চানক্য বলল, "স্যার, সেটা আপনার ইচ্ছে। তবে কাউকে দেখতে না বললেও, আমি কেসটা ঠিকভাবে হ্যাণ্ডল করতে পারব।"

"গুড! দ্যাট্‌স গুড বি দি স্পিরিট। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

৩

তার তন্ময়তা ভঙ্গ করে দরজা ঠেলে চানক্য চেম্বারে ঢুকল।

বকুল তাকে অভিনন্দন জানাল, "কনগ্র্যাচুলেশান অন দি সাকসেসফুল ট্র্যাপ।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।" চানক্য সাবধান হয়ে বকুলকে অভিবাদন করে সামনের চেয়ারে বসল।

বকুল জানতে চাইল, "কি করে করলেন?"

"আমাদের প্রায় কিছুই করতে হয়নি স্যার। একদম কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এসে চেম্বারে ঢুকে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়েছে। আমরা তো চেম্বার খোলার সময় থেকেই বসেছিলাম। খানিক পরে সি. এ. এসে খবর দিল, 'আসছে।' একজন ধূসর স্যুট পরা লোক আসতেই আমাদের ব্রিফিং মতো সি. এ. এসে তার সঙ্গে কথা বলে শার্টের পকেট থেকে পেনটা তুলে প্যান্টের পকেটে রাখল। আমরা বুঝলাম, স্যুট পরা লোকটাই ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টার তপন টিকাদার। সি. এ. ভিতরে গেল। ভিতরের রোগীটি বেরিয়ে আসতেই সি. এ. তপনকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমার একটু আশঙ্কা হচ্ছিল, ভিতরে আবার কোনোরকম গোলমাল করে না ফেলে। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই সি. এ. দরজার বাইরে এসে মাথায় চিরুনী দিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বাজপাখির মতো গিয়ে ঠিকাদারকে ধরে বললাম, 'আপনি ঘুষ নিয়েছেন।' ভয় পেয়ে থতমত করছিল। আমি সময় নষ্ট না করে একটা গ্লাসে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণ ঢেলে ওর ডান হাতটা নিয়ে ডুবিয়ে দিলাম। টাকার গায়ে লাগানো ফেনোফ্‌থ্যালিন দ্রবণে মিশে গোলাপী হয়ে গেল।"

বকুলের মনে হল, এই হাতে রঙ হয়ে যাওয়ার জন্যই কি হাতেনাতে ইংরেজি ও হিন্দি 'রেড হ্যাণ্ডেড' ও 'রাঙা হাত' হয়েছে!

চানক্য বলে চলল, "সেই দ্রবণ আবার একটা বোতলে নিয়ে সাক্ষীদের সই-সাবুদ করালাম। সাক্ষীদের সামনেই পকেট সার্চ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা

বের করে সিজ করা হল। একদম ফুলপ্রুফ অপারেশান হয়েছে স্যার। কনভিকশান হয়ে যাবে স্যার। কেউ আটকাতে পারবে না।''

''এদের হওয়াই উচিত। সে মক্কেল কোথায়? এমন মহাপুরুষের মুখটা না দেখা ঠিক হবে না।''

''আমার ঘরেই আছে স্যার। এখনিই পাঠিয়ে দিচ্ছি।''

৪

কন্‌স্টেবল সুজয় চক্রবর্তী ও রকিব আলি আসামীকে তার ঘরে নিয়ে এল। লম্বা-চওড়া চেহরা। পরনে দামী স্যুট। মুখে বাঘের মুখের হরিণের মতো অসহায়তার আশঙ্কা।

বকুল চেয়ারে দেখিয়ে বলল, ''বসুন।''

তপন বসল না। ঘাড় নেড়ে বোধহয় বলতে চাইল, দাঁড়ানোই ঠিক আছে।

বকুল বলল, ''চাকরি কত দিনের ?''

''দশ বছরের স্যার। এই বছরের শেষের দিকেই আই. টি. ও পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ....''

''হ্যাঁ, আমাদের করা ট্র্যাপে যখন ধরা পড়েছেন তখন আপনার আর আই. টি. ও হওয়া হবে না। অবধারিত সাজা হবে। আর সাজা হলে আপনাদের ওপরওয়ালার কিছু করার থাকবে না। হয় তো আপনার চাকরিটাই চলে যাবে।''

''স্যার, তাহলে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব না খেতে পেয়ে মরে যাবে স্যার।''

''সেটা ঘুষ চাওয়ার আগে মনে করা দরকার ছিল।''

''স্যার, আমি ধরা পড়ে গেছি। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার। আমি কোনও সৎ-লোককে তা করি না স্যার। ডাক্তারবাবু সৎ-লোক না স্যার।''

''ডাক্তারবাবু স্যার একসঙ্গে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, দুই সরকারের সঙ্গে চিটিংবাজি করেন।''

''কী করে?''

''স্যার, ডাক্তারবাবু নন-প্র্যাক্টিস পোস্টে চাকরি করেন। প্র্যাক্টিস না করার জন্য নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স নেন। আবার কলেজ-হাসপাতালের কাজে

ফাঁকি দিয়ে দু'বেলা চেম্বার খুলে প্রকাশ্যে প্র্যাক্টিস করেন। আবার এইভাবে প্র্যাক্টিস করে তিনি বছরে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকা রোজগার করেন। তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দশ-বারো লাখ টাকার ইনকাম ট্যাক্স পাওনা হয়। উনি এক পয়সা ডিক্লায়ার করেন না। শুধু মাত্র বেতনের টাকাটা দেখিয়ে কয়েক হাজার টাকা মাত্র ইনকাম ট্যাক্স দেন।"

চিকিৎসকের সম্বন্ধে বকুলের ধারণা খারাপ হয়ে গেল। তবে তপনের ব্যাপারেও ধারনা ভালো হল না। জিজ্ঞেস করল, "ডাক্তারবাবু যে অত টাকা রোজগার করেন, আপনার কাছে তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আছে স্যার।"

"কী রকম?"

"আমি কয়েকজন পেশেন্টকে পাঠিয়ে প্রেসক্রিপশান এবং টাকার রসিদ করে নিয়েছি।"

বকুল বুঝল, অন্যায় করে করে এদের বুকের পাটা এত বেড়ে গেছে যে, এরা অন্যায় কাজও খুব খোলামেলাভাবে করতে কোনোরকম ভয় পায় না। তার খুবই খারাপ লাগল। বলল, "বুঝলাম, ডাক্তারবাবু কয়েক লাখ টাকার ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা তো আপনার মতো লোকদের জন্যও দিতে পারছেন। তার জন্য আপনারাই দায়ী।"

"কেন স্যার?"

"কারণ, ডাক্তারবাবু ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন সেটা আপনি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সটা যাতে আদায় হয়, তার কোনো চেষ্টা করেননি। যাতে আপনাকে সামান্য কয়েক টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি এ-রকম ফাঁকি দিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করছিলেন। নিজে ঘুষ খাচ্ছিলেন।"

তপন এ-কথার কোনো উত্তর দিল না।

বকুল বলল, "যে নিজে ঘুষ খাওয়ার মতো অন্যায় করে, তার মুখে অন্যের অন্যায়ের কথা মানায় না।"

পি. বি. এক্সের ফোনটা বেজে উঠল। বকুল ধরতে অপারেটর বলল, "স্যার, সমর রায় বলে এক ভদ্রলোক আপনাকে চাইছেন।" বকুলের মনে পড়ল, সমর তার ব্যাচমেট। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার থেকে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার হয়েছে। এখন এখানেই এই শহরেই পোস্টিং আছে। অপারেটর বলল, "দিলাম স্যার।"

সমর বলল, "কেমন আছিস?"

"ভালো। তোর খবর কী?"

"ভালোই ছিল। তুই খারাপ করে দিলি।"

"কী করে?"

"এই যে ঠীকাদারকে অ্যারেস্ট করেছিস, ও আমার অধীনেই কাজ করে। এখন একশ জায়গায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমার ওপরও অ্যাসপার্সান আসবে।"

"সমর, আই অ্যাম রিয়্যালি সরি ফর দ্যাট। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।"

"যার কথা শুনে তুই ওকে ধরেছিস, সে কিন্তু লোক ভালো নয়।"

"মানলাম, সে অসৎ লোক। কর ফাঁকি দেয়। তার ফলে কী তোর ইন্সপেক্টারের ঘুষ খাওয়ার অধিকার জন্মায়? তোরা ওকে ধরে ট্যাক্স আদায় করলি না কেন? তাহলে তো কেউ কিছু বলতে পারত না।"

"আমার লোক তো অন্যায় করেছেই। তবে তোর সততাকে অস্ত্র করে ও লোকটা কিন্তু বেঁচে গেল।"

"বেঁচে যাবে কেন? তোরা ওকে ধরে ট্যাক্স চার্জ করে দে।"

"এখন আমরা কিছু করতে গেলেই সবাই বলবে, আমাদের লোককে ধরিয়ে দিয়েছে বলে আমরা ভিণ্ডিক্টিভ হয়ে ওকে হ্যারাস করছি।"

"হ্যাঁ, তা বলবে।"

"সেজন্যই বলছিলাম, তোর পক্ষে কিছু করার আছে। ওদের অ্যাসোসিয়েশানের সব লোকেরা দল বেঁধে আমার কাছে এসেছে।"

"এ-রকমভাবে ধরা পড়ার পড় ওরা দল বেঁধে যেতে পারল কেন, আমি জানি না। তুই কেন তার জন্য বলছিস, তাও আমি বুঝতে পারছি না। তবে, কেসটা এত ক্লিয়ার যে, আমার কিছু করার নেই। আমাকে মাফ কর্।"

৫

বকুলের ফোন পেয়ে চানক্য অমিত চ্যাটার্জিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসল।

বকুল অমিতকে সম্বোধন করে বলল, "মি চ্যাটার্জি! আপনি যে পোস্টে চাকরি করেন, সেটা কি নন প্র্যাক্টিস পোস্ট?"

"কেন স্যার?"

"এই মামলায় তো আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। বিপক্ষের উকিল ক্রস এগ্‌জামিন করার সময় এ-প্রশ্নটা নিশ্চয় করবেন। আমাদের তার জন্য তৈরি থাকতে হবে।"

অমিত কিছু বলল না।

বকুল বলল, "আপনি নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স নেন। তারপর প্র্যাক্টিস করাটা কী আপনি অন্যায় মনে করনে না?"

"স্যার, আমি তো কারও ক্ষতি করছি না। রোগী দেখে পয়সা নিচ্ছি। আমার কাছে এসে উপকার পায় বলেই লোকেরা আসে।"

"বেশ ভালো সংখ্যায়ই আসে। তার জন্য বছরে তিরিশ-চল্লিশ-টাকা ইনকামও হয়। কিন্তু আপনি সে-ইনকামের জন্য ইনকাম ট্যাক্স দেন না কেন? দিলে কি ঠীকাদার আপনার কাছে ঘুষ চাইতে পারত?"

"কিন্তু কী করে ইনকাম ট্যাক্স দেব স্যার? আমি প্র্যাক্টিস থেকে ইনকাম ডিক্লেয়ার করলে তো আমি যে প্র্যাক্টিস করি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"তাহলে প্র্যাক্টিসিং পোষ্ট নেবেন। না হলে প্র্যাক্টিসে যখন এত পয়সা তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাক্টিস করবেন।"

"আমি পি. জি-তে পোষ্টিং আছি বলেই তো এত রোগী আসে। চাকরি চেড়ে দিলে, এমনকী অন্য কোথাও পোস্টিং হলেও এত বেশি পেশেন্ট আসবে না।"

"অতএব আপনি নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স নেবেন, প্র্যাক্টিস করবেন, লাখ লাখ টাকার ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবেন?"

"কিন্তু স্যার, তার জন্য তো কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।"

"ক্ষতি হচ্ছে না বলছেন কেন? কলেজের ছাত্ররা আপনাকে পাচ্ছে না। হাসপাতালের রোগীরা আপনাকে পাচ্ছে না। আর আপনি যা করছেন, সেটা আপনি অন্যায়, বেআইনী মনে করেন কি না?"

অমিত কোনো উত্তর দিতে পারল না।

বকুলের ইঙ্গিত পেয়ে চানক্য তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

বকুল কম্পিউটারে চিঠি ড্রাফট করতে বসল। মামলার বিবরণ দিয়ে ডাইরেক্টরের কাছে লিখল, ইনকাম ইন্সপেক্টারের বিরুদ্ধে আমরা মামলা ভালবাবে পরিচালনা করব, যাতে তার শাস্তি হয়। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে যেন বলা হয়।

অদ্বিতীয়া

বাল্যবান্ধবী স্বপ্নার ঠেসটা চয়নিকা কোনও মতেই সহ্য করতে পারছিল না।

ছোটবেলা থেকে স্বপ্না তার প্রতিদ্বন্দ্বী। বরাবর স্বপ্না তার কাছে হেরে এসেছে। স্বামী ভাগ্যে তাকে হারিয়ে দেবে, এটা হতে পারে না। কি করে স্বপ্নাকে টিট করা যায়, সে তাই ভাবছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাহুলের চরিত্রহীনতার জন্য তার প্রতি তার প্রতিশোধস্পৃহার পারাও চড়ছিল। রাহুলের জন্যই আজ তাকে স্বপ্নার ঠেস প্রায় মুখ বুঁজে সহ্য করে ভিতরে ভিতরে গলাকাটা জন্তুর মতো ছটফট করতে হল। রাহুলের আনুগত্যহীনতা আর স্বপ্নার ঠেস মিলে তার জীবনটাকে একটা জ্বলন্ত চিমনি করে দিয়েছে। সবসময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। কল বিকল না হলে তা থামাবার কোনও লক্ষণ নেই। সে রাহুলকেও কোনও মতে ক্ষমা করবে না। রাহুলকেও সে চরম শিক্ষা দেবে। চয়নিকা পরিকল্পনা করতে লাগল। যদি কোনও প্রকারে একটা আক্কেল দেওয়া যেত!

স্বপ্নার ছেলের জন্মদিনের পার্টি উপলক্ষে তারা এসেছিল। নিজের উচ্চতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকাশ করার জন্য চয়নিকা যথেষ্ট পরিপাটি করে সেজে এসেছিল। রাহুলের অফিসের গাড়িও নিয়ে এসেছিল। রাহুলের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও, উপহার হিসেবে সোনার লকেট কিনতে বাধ্য করেছিল। কেক কাটা পর্যন্ত আসরে জাঁকিয়ে বসেওছিল। আর সকলের মাঝে নিজেকে মধ্যমণিও করে তুলে ধরেছিল। 'ড্রিংকস্ সার্ভ' করার পর মহিলারা এক কোণে এসে কার বাচ্চা-স্বামী কেমন তা নিয়ে অম্লমধুর আলোচনা করছিল। আলোচনা ক্রমে স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের ভিতর এসে পড়েছিল। তখন কার স্বামী কেমন করে আদর করে সেটাই প্রধান্য পাচ্ছিল। সেইসময় স্বপ্না চয়নিকাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তোর বরের তো অন্যরকম অভিজ্ঞতাও আছে শুনেছি। সে অভিজ্ঞতা নিয়ে তোকে কি রকম আদর করে বল্‌না।" কথাটা চয়নিকার মর্মস্থলে আঘাত করেছিল। তার মনে হয়েছিল, স্বপ্না তাকে

ইচ্ছে করে সকলের সামনে হেনস্থা করতে চাচ্ছে। সকলের সামনে বলতে চাচ্ছে, তার স্বামী অসচ্চরিত্র। বাইরে সে হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই গুম মেরে গিয়েছিল। না খেয়েই রাহুলকে তার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল।

২

রাহুলের একদমই ভালো লাগেনি। তার যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যখন গিয়েই পড়েছে, তখন খাওয়া-দাওয়া না করে, মাঝপথে বিনা কারণে, ওরকম হুটহাট করে বেরিয়ে আসার কোনও মানে হয় না। বাড়িতে গিয়ে হয় রান্না চড়াতে হবে, না হয়, না খেয়েই থাকতে হবে। পার্টিতে খেয়ে যাবে বলে কাজের মেয়েকে রাতের রান্না করতে মানা করেছে। চয়নিকা তো রান্না করতে যাবে না। খেতে হলে তাকেই রান্না করতে হবে। চয়নিকাকে বিয়ে করে তার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে।

চয়নিকা বদমেজাজী। চয়নিকা খিটকিটে। রাহুল কখনো তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারে না। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলিয়ে, গুম মেরে থাকে। যেমন এখন আছে। রাহুল জানতে চাইল, "বেশ তো ছিলে, হুইস্কিও খাচ্ছিলে। হঠাৎ করে কি হল? আমাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলে?"

"কিচ্ছু হয়নি। আমাকে বিরক্ত কোরো না, প্লিজ!"

রাহুলের মগজে আগুন জ্বলে গেল। এ-রকম মহিলার সঙ্গে আর যাই হোক ঘর করা যায় না। কেন যে তার জাঁকজমক দেখে তাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল? রাহুল বরাবরই পড়াশোনায় ভাল ছিল। খড়্গপুর আই. আই. টি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বি. টেক এবং কোলকাতা আই. আই. এম থেকে পারসোনাল ম্যানেজমেন্টে পি. জি. ডি. এম করে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমেই বহুজাতিক কম্পিউটার কোম্পানিতে এমন মাস মাইনেতে যোগ দিয়েছিল, যা এখানকার অনেকের বছরের বেতনের চেয়ে বেশি। তার মতো পাত্র খুব কমই পাওয়া যায়। অনেক প্রস্তাব আসতে লাগল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাহুলের উচ্চাকঙ্ক্ষিনি চয়নিকাকেই পছন্দ হল। এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, দুই উচ্চাকাঙ্ক্ষীর সংসার বোধহয় সুখের হয় না। সুখী হতে হলে কিছু ভালবাসার, কিছু মেনে নেওয়ার ক্ষমতাও থাকা চায়। এর থেকে তার বাল্যবান্ধবী খেয়া অনেক ভালো ছিল। তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে

সে ঠিক করেনি। গত সপ্তাহেই খেয়ার বিয়ে হয়ে গেল। তার ব্যক্তিগত সহায়ক, শ্রাবস্তীও চয়নিকার থেকে অনেক ভালো। কত সহানুভূতিশীল, কত স্নিগ্ধ। কথা বলতে, কাছে ডাকতে ইচ্ছে করে। সামনের সপ্তাহে শিলিগুড়িতে সে শ্রাবস্তীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবুও খানিকটা সময় ভালো কাটবে। একসঙ্গে খাবে, গল্প করবে, তারপর শ্রাবস্তীর ওপর নির্ভর করবে।

৩

চয়নিকা বরাবর প্রথম হয়ে এসেছে। মাধ্যমিকে, উচ্চমাধ্যমিকে স্ট্যাণ্ড করেছে, বি. এস-সি, এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। স্বপ্না তাকে কখনো ছুতে পারেনি। নেট পরীক্ষায় স্বপ্না সফল হলেও কলেজের কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। চয়নিকা তার ইউনিভার্সিটিতেই কাজে যোগ দিয়েছে। বিয়েতেও সে স্বপ্নাকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছিল। কোথায় স্বপ্নার কলেজের লেকচারার স্বামী আর কোথায় তার মাল্টিন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ স্বামী। তার স্বামীর গাড়ি আছে, বাংলো আছে। স্বপ্নার লেকচারার স্বামী এ-সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু তার নিজের স্বামী রাহুল তার প্রতি অনুগত নয়। বিয়ের আগেও তার অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এখনো আছে। ব্যাপারটা চয়নিকা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু স্বপ্না তা নিয়ে ঠেস দেওয়ার পর সে আর সহ্য করতে পারছিল না। স্বপ্নাকে সে কিছুতেই টেক্কা দিয়ে যেতে দেবে না।

বাড়িতে ফিরেই সে শোভনকে ফোন করল। বলল, "আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ায় চলে আসতে বাধ্য হলাম। কিছু মনে করবেন না।"

"আমার কথা ছাড়ুন। আপনার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলুন।"

"না, না। আমি স্বপ্নার সঙ্গে কথা বলব না। আপনি বলে দিলেই হবে। আমি দুয়েক দিনের মধ্যেই দেখা করব।"

"খুব ভালো কথা! চলে আসুন। রাহুলকে নিয়ে আসবেন। বেচারার একদম যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। আপনি জোর করে নিয়ে গেলেন।"

"ওর সময় কোথায়? অফিস ছুটি নেই। আমার ইউনিভার্সিটি ছুটি। ও বেরিয়ে গেলে আমি আপনাকে ফোন করে নেব। আগামী কাল কী করছেন? আপনার কলেজও তো ছুটি।"

"হ্যাঁ, তাই আমি আর স্বপ্না ঠিক করেছি, একবার দিঘা থেকে ঘুরে আসব।

বিচে দুজনে হাঁটব, খুনসুটি করব, জলে জড়াজড়ি করব, স্নান করব, হোটেলের ঘরে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখব। কেমন মজা হবে বলুন।"

চয়নিকার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করেতে লাগল। রাহুল তো তাকে এরকম করে কোনওদিন বলেনি। বললে কি তার ভালো লাগত না? কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা অন্য জগতের ছোঁয়া আছে, যা তাকে এর আগে আর কখনো স্পর্শ করেনি। স্বপ্নাকে তার থেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে হল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, খুব মজা হবে।"

"চলুন না, যাবেন আমাদের সঙ্গে?"

"ওর তো ছুটি নেই। পরে কখনো যাব। ফিরছেন কবে?"

"রবিবার ফিরে যাব। সোমবার কলেজে যেতে হবে না?"

"আমি পারলে সোমবার আপনার সঙ্গে দেখা করে নেব। আপনার কলেজের নম্বরটা দিয়েছেন। বললে ওরা ডেকে দেয়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে ক্লাসে থাকলে এমার্জেন্সী না হলে আমার ডাকতে মানা করা আছে। আপনি টিফিনের সময় ফোন করুন। আমি ঘরেই থাকি।"

"ওকে। বাই।"

৪

রাহুল বলল, "আগামী কাল আমি শিলিগুড়ি যাচ্ছি।"

"ফ্লাইটে?"

"না, ট্রেনে।"

"কেন?"

"দুপুরে একটা মিটিং ডাকা আছে। শেষ হওয়ার আগেই ফ্লাইট ছেড়ে যাবে।"

"পরের দিনে যেতে।"

"ওখানে দেরি হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা। কখন ফিরছ।"

"ডোন্ট ওরি, মাই ডার্লিং। পরের দিন ফ্লাইটেই ফিরে যাব।" রাহুল চয়নিকাকে জড়িয়ে ধরল।

চয়নিকা এক ঝটকায় রাহুলকে সরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, "এত

আদিখ্যেতা কিসের জন্য?"

রাহুল মনে মনে জ্বলতে লাগল। মুখে কিছু না বলে চলে গেল।

চয়নিকা শোভনকে ফোন করল, "কাল একদিন ছুটি নিতে পারেন না?"

"কেন?"

"তাহলে আপনার সঙ্গে কোথাও ঘুরে আসা যেত। দিঘা গিয়ে তো ফিরে আসা যাবে না। ধরুন, হীরক বন্দর বা স্বর্ণদ্বীপ।"

"আমি ছুটি পেয়ে যাব। কিন্তু স্বপ্না পাবে কি না বলতে পারছি না।"

"স্বপ্না না গেলে কি আপনার যাওয়া হতে পারে না?" চয়নিকা একটু ঠেস দিয়েই বলল, "আমার সঙ্গে কোথাও গেলে কি স্বপ্না কিছু মনে করবে?"

"না, না। সে-কথা নয়। কিন্তু আমরা একে অপরকে ছাড়া কোথাও যাই না।"

"একদিন আমার সঙ্গে চলুন।"

"আচ্ছা চলুন। কোথায় যাবেন, বলুন।"

"যেখানে হয়, একটা ঘর বুক করে রাখুন। যাব, একটু ঘুরব, বিশ্রাম করব, তারপর ফিরে আসব।"

"আচ্ছা আমি করে নিচ্ছি।"

"আপনি ফোন করে দিলেই আমি চলে যাব।

৫

দশটার সময় বাবুঘাটে পৌঁছে চয়নিকা দেখল, শোভন তার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। সে পৌঁছুতেই বাসে উঠে বসল। দেড়টা নাগাদ বাস স্বর্ণদ্বীপে পৌঁছল। নদীর বিস্তার এখানে অনেক বেশি। তার মাঝখানে একটা দ্বীপ জেগে উঠেছে। তার ওপর পর্যটন বিভাগ একটা হোটেল করেছে। তারা নৌকা করে হোটেলে পৌঁছুল। তাড়াতাড়ি দুপুরের খাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল। নৌকা চড়ল, নদীর তীরে তীরে ঘুরল, পাশের বনে পশুপাখি দেখল, সাঁঝের বেলা নদীর ওধারে বড় থালার মতো রাঙা সূর্যটার ডুবে যাওয়া দেখল, তারপর বাড়ি ফেরার জন্য হোটেলে ফিরল।

শোভন ব্যাগ গোছাচ্ছিল।

চয়নিকা বলল, "আর এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যাক।"

ব্যাগ গোছানো রেখে শোভন বলল, "ঠিক আছে, আমি চা দিতে বলছি।"

"না, না। আপনি গুছিয়ে নিন। নিয়ে আসতে বলছি।" বলেই সে বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে নিজেই দু'কাপ চা নিয়ে এল।

চা খাওয়ার পর শোভন বলল, "চোখটা এঁটে আসছে। একটু গড়িয়ে নিই।"

চয়নিকা বলল, "হাঁ, হ্যাঁ। এখনো অনেক সময় আছে। সাতটার বাসটা ধরলেই দশটার দিকে পৌঁছে যাব।"

শোভন শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। চয়নিকা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। তাদের রাতের খাবার বলা ছিল না। কেউ ডাকতে এল না। ঘর একদিনের জন্য ভাড়া করা ছিল। কেউ ঘর ছেড়ে দিতে বলতেও এল না। রাত গোটা দশেক হতেই সে-ও শুয়ে পড়ল।

৬

ঘুম ভাঙতে শোভন দেখল, চয়নিকা তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। তাদের দুজনের কারও শরীরে কোনও পোশাক নেই। শুধু একটা চাদর তাদের দুজনকে ঢেকে আছে। সে সন্তর্পণে চয়নিকার হাতটা ছাড়িয়ে উঠল। চয়নিকা তখনো নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। চা খাওয়ার পর সে শুয়ে পড়েছিল। তারপর কি করে এ-রকম হল, সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে। আর দেরি করা যাবে না। স্বপ্না নিশ্চয় এতক্ষণ বাড়ি ফিরে তার জন্য দুশ্চিন্তা করছে। ফিরে এখন স্বপ্নাকে সে কি বলবে? তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার মধ্যেই সে চয়নিকাকে জাগানোর জন্য মাথায় হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম ভাঙল না। ঘড়ির দিকে তাকাতে শোভন চমকে উঠল। সকাল পাঁচটা বেজে গেছে। তার মানে তারা সারা রাত এ-ভাবে কাটিয়ে দিয়েছে। এখন স্বপ্নার সামনে সে কোনো মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে? কি কৈফিয়ৎ দেবে?

দূরের গ্রামে 'কোকোর কো' করে মোরগ বাঁক দিল। পাশের বনে 'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া' করে শিয়াল ডেকে উঠল। তা শুনে কুকুরগুলো 'ঘেঁউ ঘেঁউ' করতে লাগল। শোভনের বুকটা খরগোশের মতো লুকানোর জায়গা খুঁজছিল। সে চয়নিকাকে জাগাবার জন্য শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু চয়নিকা যেন অনেক প্রশান্তিতে মরার মতো ঘুমুচ্ছে।

শোভন সিদ্ধান্ত নিল, সে একাই চলে যাবে। সিদ্ধান্ত মতো চিঠি লিখতে

বসল। লিখল :

চয়নিকা,

সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না। আমার ইতিমধ্যেই অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করা যাবে না। আমি চলে গেলাম। হোটেলের সব বিল মেটানো আছে। আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আপনি চলে আসুন। ফোনে কথা হবে। ইতি,

শোভন।

ঘন্টাখানেক পরে চয়নিকা উঠে তার মোবাইল থেকে থানায় ফোন করল।

হোটেলে পুলিশের লোক দেখে ম্যানেজার চমকে উঠল।

৭

বাড়িতে পুলিশের লোক আসতে দেখে স্বপ্নার বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল।

সাতটার দিকেই শোভন ফিরে আসে। কোনও কাজ থাকলে দেরি হয়। কিন্তু এগারটার পর কোনোদিন হয় না। কাল সারারাত ফিরে না আসায় দুশ্চিন্তাতে সে ঘুমুতে পারেনি। তার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল শোভনের সহকর্মী সুনীলকে ফোন করার পর। সংকোচের বাধা সরিয়ে রাত সাড়ে বারোটার দিকে স্বপ্না সুনীলকে ফোন করেছিল। সুনীল ঘুম ঘুম গলায় জানিয়েছিল, "শোভন তো আজ কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছে বউদি!"

শোভন ছুটি নিয়েছে! সে কিচ্ছু জানে না। তা কি করে হয়? এরমধ্যে নিশ্চয় কোনও গোলমাল আছে। তাই সে বুঝে উঠতে পারছিল না, এখনই থানায় খবর দেবে কি না। কিন্তু পুলিশ নিজে থেকেই তার বাড়িতে আসছে কেন? তা হলে কি শোভনের কোনও বিপদ হল?

পুলিশের লোক এসে তাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি প্রফেসর শোভন সোমের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি তার ..?"

"স্ত্রী।"

"প্রফেসর সোমকে ডেকে দিন।"

"উনি তো বাড়িতে নেই।"

"তার মানে মাল খবর পেয়েই কেটে পড়েছে।"

"কি বলছেন? উনি কাল বাড়িতেই ফেরেন নি।"

"ফিরবে কি করে? অন্যের স্ত্রীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে হোটেলে বলাৎকার করলে আর কি করে ফিরবে?"

"কি যা তা বলছেন? শোভন ও-রকম কাজ করতেই পারেই না।"

"আমরা বলছি না, ম্যাডাম। যাকে বলাৎকার করেছে, সে কি বলছে, একবার পড়ে দেখুন। আপনিও তো একটা কলেজে পড়ান শুনেছি। আপনারা, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোকেরা এত নোংরা যে, আপনাদের কথা ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে।" সে এত্তেলার কপিটা স্বপ্নার দিকে এগিয়ে দিল।

অপমানে, ক্ষোভে স্বপ্নার গা রি রি করছিল। তবুও কোনওরকমে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল:

মহাশয়,

আমার বাল্যবান্ধবী স্বপ্নার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে শোভন সোমকে আমি চিনতাম। গতকাল সে আমাকে ফোন করে বলে যে, তিনি সস্ত্রীক স্বর্ণদ্বীপ বেড়াতে যাচ্ছেন। আমরা তাদের সঙ্গে যেতে পারি। আমার স্বামীর শিলিগুড়ি যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। স্বপ্না যাচ্ছে জেনে আমি যেতে রাজি হয়ে যাই। বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে স্বপ্নাকে দেখতে না পেলে তিনি বলেন যে, স্বপ্নারা দেরী হতে দেখে আগের বাসে চলে গেছে। ওখানে গিয়ে দেখা হবে। আমি সরল বিশ্বাসে তার সাথে চলে যাই। তিনি আমাকে নিয়ে এই হোটেলে ওঠেন। সেখানে স্বপ্না না থাকায় আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবার জন্য বলি। কিন্তু তিনি আমাকে চায়ের সঙ্গে কি খাইয়ে দিলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আজ সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি, আমি বিবস্ত্র হয়ে বিছানায় পড়ে আছি। শোভন ধারে-কাছে কোথায় নেই। আমার মনে হচ্ছে, ঘুমের সুযোগ নিয়ে কেউ আমাকে বলাৎকার করেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শোভনকে পেলাম না।

এমতঅবস্থায় ঘটনার তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত,

চয়নিকা ঘোষ (হাজরা)।

স্বপ্না ভাবতেই পারছিল না।

পুলিশের লোক বলল, "হোটেলের রুম আপনার স্বামীর নামে বুক করা ছিল। মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাকে রেপ করা হয়েছে। তার প্রাইভেট্স পার্ট্সে সিমেন পাওয়া গেছে। আপনার স্বামীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।"

স্বপ্না কাগজটা মুহ্যমানের মতো এগিয়ে ধরল। পুলিশের লোকেরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। আর তখনই শোভনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

পুলিশ দেখে শোভন ভয় পেয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ চলে এল? তাহলে কি হোটেল থেকে এরমধ্যেই তার নামে অভিযোগ করেছে? না সে ফিরে না আসায় স্বপ্না থানায় খবর দিয়েছিল? সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্বপ্না, কি হয়েছে?"

স্বপ্না মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পুলিশের লোক বলল, "আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

"কেন?"

"চয়নিকা দেবী আপনার বিরুদ্ধে বলাৎকারের অভিযোগ এনেছে।"

শোভন চমকে উঠল। সে বোঝার চেষ্টা করছিল, চা খাওয়ার পর কি হল।

পুলিশের লোকেরা তাকে নিয়ে চলে গেল।

৮

বিমান বন্দরে সান্ধ্য কাগজ পড়েই রাহুল চমকে উঠল। স্বপ্নার স্বামী শোভনের প্রতি যারপরনাই রুষ্টও হল। শোভনটাকে সে শেষই করে ফেলবে। কিন্তু সে তো এখন পুলিশ হেফাজতে। চয়নিকা কোথায়? বাড়িতে ফোন করতে কাজের মেয়ে বলল, "মেমসাহেব এইমাত্র ফিরে বাথরুমে ঢুকেছেন।" তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে রাহুল চয়নিকার সামনে দাঁড়াল, "কি হয়েছিল, বলো তো?" সব শুনে ঘোষণা করল, "হাজত থেকে বের হলে স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি শেষ করেই ফেলব।" তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে যেতে চাইলে কেন?"

চয়নিকা পাত্তা না দিয়ে বলল, "যার স্বামী স্ত্রীর নামে টিকিট কেটে অন্য মেয়েকে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাশের দু'সিটের কুপে-তে ওঠে, তার স্ত্রীর আর কি

করার থাকতে পারে? শ্রাবন্তীকে কোথায় ছেড়ে এলে? শোভনকে শেষ করতে চাইতে তোমার লজ্জা করছে না? শ্রাবন্তীকে তুমি বিয়ে করবে কি?"

কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ পেলে বিষধর গোখরোও যেমন ফনা নামিয়ে পালিয়ে যায়, তেমনি রাহুলও ঢোঁড়া সাপের মতো মুখ নিচু করল।

তার সামনেই চয়নিকা স্বপ্নাকে ফোন করে বলল, "আমার স্বামীটা যে চরিত্রহীন, তা সবাই জানত; কিন্তু তোর স্বামীটা যে এ-রকম অসচ্চরিত্র, সেটা জানা ছিল না।"

মুখোমুখি

সকাল সাতটায় দিল্লির প্লেন ধরতে হবে। এক ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ ছটার মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছুতে হবে। জ্যামে না পড়লেও আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে রওনা দিতে হবে। প্রাতকৃত্য করতে, হাতমুখ ধুতে, দাঁড়ি কাটতে, জামাকাপড় পড়তেও দশ-পনের মিনিট লাগবে। অ্যালার্ম বাজলেও আলস্যে উঠতে উঠতে কিছুটা সময় কেটে যায়। বকুল হিসেব করে পাঁচটার সময় অ্যালার্ম সেট করল। সরকারি আদেশের কপি এবং টিকিটটা পকেটে রাখল। আর কিছু ভুললেও চলবে। কিন্তু টিকিট না থাকলে প্লেনেই উঠতে পারবে না। আদেশের কপি না থাকলে প্লেন থেকে নেমে কোথায় যেতে হবে ড্রাইভারকে বলতে পারবে না। হ্যাঁ, বঙ্গভবনে কপি পৌঁচেছে তো? বকুল ফোন করল। ওখন থেকে জানতে চাইল, "স্যার, আপনি আই. সি ২৬৩-তে আসছেন তো? গাড়ি নিয়ে সুরেশ থাকবে স্যার।" বকুল স্বস্তিবোধ করল। তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। পাঁচটায় উঠতে হবে। একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে শুতে গেল।

হঠাৎ মনে পড়ল, ওরা একটা প্রেজেন্টেশান তৈরি করে নিয়ে যেতে বলেছিল। দুদিন আগে খবর পেয়েছে। দুদিনই খুব ব্যস্ততা ছিল। করে উঠতে পারেনি। শারদীয়া সংখ্যার লেখাটা আজই শেষ করেছে। বকুল না করে নিয়ে গেলে, ওরা যদি প্রথম দিনই চায়! বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালল। ল্যাপটপটা খুলে বসে পড়ল। বিষয় 'পুলিশে ঠিক লোক নিয়োগ করা।' খানিকটা লেখার পরই মনে হল, একটু দেখে নেওয়া দরকার ছিল। আলমারী খোঁজ করে কয়েকটা বই বের করল। তার মধ্যে একমাত্র ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমীর 'পুলিশের ম্যানজারদের জন্য ম্যানেজমেন্ট'-এ একটা প্রবন্ধে কিছু তথ্য পেল। এম. বি. এ পড়ার সময় মানবসম্পদ ম্যানেজমেন্ট পড়েছিল। সে বইটা একবার খুলল। নির্দিষ্ট অধ্যায়টা পড়ে নিয়ে লিখতে লাগল। লেখা শেষ করে দেখল, পৌনে বারোটা বেজে গেছে। ল্যাপটপটা ব্যাগের মধ্যে

ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বেড-সুইচটা অন্ করে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। সবে দুটো বাজছে। টেবিল-ঘড়িটা তুলে দেখল অ্যালার্ম বাজেনি। অর্থাৎ উৎকণ্ঠার জন্যই ও-রকম মনে হয়েছে। এই জন্যই সে সন্ধ্যার ফ্লাইটে চলে যেতে চেয়েছিল। তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারত। কিন্তু কাজ পড়ে গেল। বিকেলে বেরুতে পারার সম্ভাবনা ছিল না। সন্ধ্যার ফ্লাইটে যাওয়া হল না। আলোটা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল।

স্নিগ্ধা লাইব্রেরীতে ঢুকছিল। বকুল সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। তার বুকের মধ্যে একটা সুন্দর অনুভূতি হল। সকল ঘটনার পিছনেই নিশ্চয় কোনও কারণ থাকে। মানুষ তা সবসময় বুঝতে পারে না। বকুল কিছুতেই বুঝতে পারে না, স্নিগ্ধাকে তার এত ভালো লাগে কেন। সুগন্ধিযুক্ত সাদা জুঁই বা বেলি ফুল তার ভালো লাগে। স্নিগ্ধা পাড়হীন একটা সাদা শাড়ি পরে আছে। মুখটা আলতো করে নামানো। হালকা একটা সেন্টও ভেসে আসছে। স্নিগ্ধাকে শিশিরে সিক্ত সাদা জুঁই ফুলের মতো লাগছে। কিন্তু মুখটা পালটে যাচ্ছে কেন? এ যে দেখছি, মীনা। একটা ডোরাকাটা শাড়ি পরে, লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। পাশ থেকে কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "তোর হাবি।" মীনা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "হি ইজ নো মোর মাই হাজব্যাণ্ড।" বকুলের মনে পড়ল মীনা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। বুকের মধ্যেটা তার জ্বালা করে উঠল। আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল।

তখনো স্বপ্নের রেশটা লেগে ছিল। দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। হৃদয় বিদীর্ণ করা বাক্যটা কানে বাজছিল। বকুলের অনুভূতিটা এমন দূষিত হয়ে গেছে যে, তার স্বপ্নেও সুখ নেই। মীনার স্মৃতিটা তার ছেড়ে যাওয়ার তিক্ত অনুভূতির সঙ্গে এতটাই যুক্ত হয়ে গেছে যে, অনুভূতি ছাড়া সে মীনাকে কখনো স্বপ্নে দেখে না। মীনা তো তার জীবনেও এসেছিল। কিছুদিন কাছেও ছিল। সেসব নিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখে না। মীনাকে নিয়ে স্বপ্ন মানেই তাকে ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য। বকুলের অসহ্য লাগে। সে এ-স্বপ্ন দেখতে চায় না। স্বাভাবিক থাকলে, গভীর ঘুম হলে, দেখেও না। কিন্তু সাময়িক কোনও আঘাতে বা উৎকণ্ঠায় ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলেই স্বপ্ন দেখে। মীনার ছেড়ে যাওয়ার স্বপ্ন তার পুরানো ঘা টাকে আবার বিষিয়ে তোলে।

বকুল ভাবছিল। যদি শুধু স্নিগ্ধার স্বপ্নটাই দেখত। তাহলে কি ক্ষতি হত?

সে ভাবার চেষ্টা করল। স্নিগ্ধার সঙ্গে তার সম্পর্কও তো মিলনান্তক নয়। পুরোপুরি বিয়োগান্তক। কলেজের পড়া শেষ করে যখন সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল তখনই স্নিগ্ধার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। স্নিগ্ধা তখন ফিজিক্স অনার্স শেষ করে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে কম্পিউটার নিয়ে বি. টেক পড়ছে। আলাপ হয়েছিল অনার্স নিয়ে পড়ার সময়ই। কেমিস্ট্রির ক্লাসে পাশে বসে স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই তো ফিজিক্সেও অনার্স পেয়েছিলি। কেমিস্ট্রিতেও। তা ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রিতে অনার্স না নিয়ে ম্যাথেমোটক্সে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলি কেন?"

একটুও না ভেবে বকুল বলেছিল, "তুই ফিজিক্সই পড়িস, আর কেমিস্ট্রিই পড়িস, ম্যাথেমেটিক্স না পড়লে পড়তে পারবি না।"

স্নিগ্ধা সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, "তা পারব না।" তারপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল, "তো?"

বকুল বলেছিল, "কিন্তু ম্যাথেমেটিক্স তোর ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি না পড়েই পড়া যায়।"

"কিন্তু তুই তো ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়ছিস।"

"পড়ছি, কিন্তু আমি ইচ্ছে করলেই না পড়ে তার জায়গায় ইকোনমিক্স-জিওগ্রাফি পড়তে পারি। এমনকি হিস্ট্রি-পলিটিক্সও। কিন্তু তোকে ফিজিক্স পড়তে হলে ম্যাথেমেটিক্স পড়তেই হবে।"

উত্তরটা স্নিগ্ধার খুব ভালো লাগেনি। কিন্তু মনে হয়েছিল, কেউ ও-রকম করেও ভাবতে পারে। আর তার থেকেই বকুলের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়তে থাকে।

বকুলেরও স্নিগ্ধাকে খুব ভালো লাগত। কিন্তু তার ভালো লাগার অনেক দিগন্ত ছিল। চরমপন্থী রাজনীতি তাকে আকর্ষণ করল। ক্লাস কামাই হতে থাকল। পরীক্ষার ফল ভালো হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মতো নম্বরও পেল না।

স্নিগ্ধা বি. টেক-এ ভর্তি হল। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এল। অঙ্ক দেখাতে এসে বলল, "তুই যদি অন্তত ক্লাসগুলোও করতিস, তাহলে, এ-রকম হত না।"

বকুলের যে খারাপ লাগেনি তা নয়। তবু সে ব্যথা লুকিয়ে বলেছিল, "দেখ, তাহলে শুধু বুদ্ধি থাকলেই যে ভালো রেজাল্ট হয় না, ভালো

রেজাল্টের জন্য পড়তে হয়ই; সেটা হৃদয়ঙ্গম হত না।"

"হৃদয়ঙ্গম তো হল, এবার কি করবি?"

"আর একটু পড়াশোনা করে গবেষণা করতে পারলে ভালো লাগত। যখন হল না, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসব।"

"গবেষণা করবি তো ম্যাথেমেটিক্স নিয়ে পড়তে গেলি কেন? ফিজিক্স নিয়েও তো পড়তে পারতিস।"

"বি. টেক পড়ছিস। এম. টেক পড়। তারপর বুঝবি, হায়ার ম্যাথেমেটিক্স আর হায়ার ফিজিক্সে ফারাক খুব সামান্যই।"

"ফারাক যদি সামান্যই, তাহলে ফিজিক্স পড়লি না কেন? তাহলে রেজাল্ট অত খারাপ হত না। আমি রেগুলার নোট করেছিলাম। তাতে তোরও হয়ে যেত।"

এমনিতেই পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার ফলে বকুলের খারাপ লাগা ছিল। তার ওপর স্নিগ্ধা উপদেশ দিচ্ছিল। উপদেশ তার কখনই ভালো লাগে না। বোধহয় কারওই লাগে না। বকুলের খারাপ লাগল। আপত্তির সুরে বলে ফেলল, "আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।আমি ঠিক দাঁড়িয়ে যাব।"

স্নিগ্ধারও মেজাজ ভালো ছিল না। বকুলের কথা তার আপত্তিজনক ঠেকল। কড়া ভাষায় হুশিয়ারী দিয়ে বলল, "আমাকে ভাবতে হবে না মানে? তুই কি আর কাউকে জোগাড় করেছিস? তা করতে গেলে আমি তোকে খুন করে ফেলব। মনে রাখবি, তুই আমাকেই বিয়ে করবি।"

বলেই স্নিগ্ধা রেগেমেগে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় বকুল বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। স্নিগ্ধা তার সহপাঠিনী। স্নিগ্ধাকে তার ভালো লাগত। বিয়ে করার ইচ্ছেও যে মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু বলতে পারেনি। প্রথমত স্নিগ্ধারা খুবই ধনী লোক। তার বাবা শহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সেই তুলনায় বকুলের বাবা খুবই গরিব। দ্বিতীয়ত স্নিগ্ধা ভালো ফল করে বি. টেক পড়ছে। এম. টেক পড়বে। খুব তাড়াতাড়ি একটা মোটা মাইনের চাকুরী পেয়ে যাবে। সে বকুলের মতো ছেলেকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? বকুল হিসেব মেলাতে পারছিল না। তাতে তার খারাপও লাগছিল না। পরের দিনই সে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিল। তারপর নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও মনপ্রাণ দিয়ে তৈরি হচ্ছিল।

হতে গিয়ে তার মনে হল, কোলকাতা গিয়ে তৈরি হতে পারলে ভালো হত। ওখানে অনেক লাইব্রেরি আছে। আর স্নিগ্ধাও আছে। মাঝেমধ্যে দেখা হতে পারবে। সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ক্লার্কশিপ পরীক্ষাটা দিয়ে দিল। পেয়েও গেল। রাইটার্সে কাজে যোগ দিয়ে সি. আই. টি রোডে একটা মেসে উঠল। তবে স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা আর সফল হল না। প্রক্টর অ্যাণ্ড গ্যাম্বলের এক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। বকুল শুনেছিল, স্নিগ্ধা প্রথমে বিয়েতে মত দেয়নি। বকুলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল। ওর বাবা পাত্তাই দেয়নি। বাবা তুলনা করে বলেছিল, "তুই নিজে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছিস। একটা মাছিমারা কেরানীকে বিয়ে করে পরিচয় দিবি কি করে। ওর না আছে কোনও প্রতিষ্ঠান, না আছে বংশমর্যাদা। কেরানীর ছেলে কেরানীই হয়েছে। যাকে বলে বাপকা ব্যাটা। তুই ওর কথা ভুলে যা।" তার উত্তরে বলার খুব বেশি স্নিগ্ধার ছিল না। সে নিজেও বকুলের খামখেয়লির জন্য বিরক্ত ছিল। কাজেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বকুলের সাময়িক তখন একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু এখন আর কষ্ট হয় না। কেন হয় না?

বকুলের মনে হয়, স্নিগ্ধা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বিয়ে করলে তার ভালোই লাগত। কিন্তু তাকে বিয়ে করেনি বলে কষ্ট হয় না। তার কারণ বোধহয়, স্নিগ্ধার কাছ থেকে সে তেমন কিছু আশা করেনি। তাকে বিয়ে করার জন্য স্নিগ্ধার কোনও দায়িত্ব ছিল বলেও তার মনে হয় না, বিশেষ করে যখন সে তখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। স্নিগ্ধা তুলনায় ভালো অবস্থানে থেকেও তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। পারেনি।

কিন্তু মীনাকে সে বিয়ে করেছিল। মীনার প্রস্তাব মতো বিয়ে করেছিল। মীনা তার সঙ্গে সারাজীবন থাকার কথা দিয়েছিল। তার বিবাহিত স্ত্রীর কথা সে বিশ্বাস করেছিল। বকুলও সারাজীবন তার সঙ্গে থাকবে ঠিক করেছিল। মীনার কাছ থেকে সে বিশ্বাসযোগ্যতা আশা করেছিল। মীনা তার বিশ্বাস ভেঙেছিল। সে বিশ্বাসভঙ্গতা বকুল আজও মেনে নিতে পারেনি। বকুলের আজও মনে হয়, মীনা তার সঙ্গে কৃতঘ্নতা করেছে। সে বুঝতে পারে, তাকে ক্ষমা করে দিতে পারলেই শান্তি হয়। কিন্তু মন থেকে তা করতে পারে না। তাতে মীনার কিছুই হয় না। সে-ই ক্ষতবিক্ষত হয়। এখনো হচ্ছিল।

আলো জ্বালিয়ে দেখল, চারটে বাজছে। আর ঘুম আসবে না। সে উঠে

পড়ে তৈরি হতে লাগল। জামাকাপড় পরা হলে ইজি চেয়ারে বসে ম্যানেজমেন্টের বই খুলল। ভালো লাগল না। টিভি চালিয়ে খবর দেখতে লাগল। সাড়ে পাঁচটার সময় দরজার কলিং-বেল বাজল। বকুল এয়ারলাইন্সের অফিসে ফোন করল। তারা জানাল, ফ্লাইট ঠিক সময়েই আছে। বকুল ব্যাগটা নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। সকালবেলায় রাস্তা ফাঁকা ছিল। ছটার মধ্যেই পৌঁছে গেল। পকেট থেকে টিকিটটা বের করে ব্যাগটা নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ডিসপ্লে বোর্ডে দেখল, তার ফ্লাইট ঠিক সময়েই আছে। এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বোর্ডিং পাস নিল। তারপর লাউঞ্জে বসে সিকিউরিটি চেকের ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অন্য অনেক ফ্লাইটের ঘোষণা হতে লাগল। কিন্তু তার ফ্লাইটের হল না। সওয়া ছটা হল, সাড়ে ছটা হল, পৌনে সাতটা হল। ঘোষণা হল না। বকুল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। বোর্ডে লেখাগুলো বদলাতে শুরু করতেই সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বোর্ডে সিকিউরিটি চেকের ঘোষণার বদলে দেরির ঘোষণা ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেও ঘোষণা হল, "ডিউ টু আনঅ্যাভয়েডেব্‌ল সারকামস্ট্যান্সেস আই সি টু সিক্স থ্রি টু ডেল্‌হী উইল বি ডিলেড। নাউ দি এস্টিমেটেড টাইম অফ ডিপার্চার ইজ নাইন ফিফটিন। ইনকনভেনিয়েন্স কজ্‌ড টু দি প্যাসেঞ্জার ইজ রিগ্রেটেড।" বকুলের এত রাগ হল যে, ইচ্ছে করল গিয়ে লোকগুলোকে গুলি করে দেয়। তার ট্রেনিং শুরু হবে সাড়ে নটায়। প্লেনের দিল্লি এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর কথা নটায়। তার কোনও রেজিস্টার্ড লাগেজ নেই। এয়ারপোর্টে গাড়ি আসবে। নেমে গাড়ি করে সাড়ে নটার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু এখন আর দেরি না করলেও সওয়া নটায় ছাড়বে। সওয়া এগারটার আগে পৌঁছুবে না। তার নিজের সবরকম সতর্কতা সত্ত্বেও এই এয়ারলাইন্সের কর্মচারীদের অপদার্থতা, অনিয়মানুবর্তিতার জন্য তার পৌঁছুতে দেরি হবে। সে নিয়মানুবর্তী নয় প্রমাণিত হবে। বকুল অসন্তোষে ছটফট করতে লাগল। সিকিউরিটি চেক হলেও সওয়া নটায় প্লেন ছাড়ল না। ছাড়ল সাড়ে নটায়। দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছুল সাড়ে এগারটারও পর। বকুল প্লেন থেকে নেমেই ছুটতে লাগল। সুরেশ গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠেই বকুল তার হাতে ঠিকানাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "বঙ্গভবন নয়, এখানে চলুন।" গাড়ি চলতে লাগল।

বারোটার সময় গাড়ি এসে ইন্সটিট্যুট অফ ম্যানেজমেন্টের গেটের কাছে দাঁড়াল। বকুল ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল। সটান্ এসে রিসেপ্শানের সামনে দাঁড়াল। চেয়ারের ভদ্রমহিলা তার নামের পাশে দাগ দিয়ে তাকে নিয়ে কনফারেন্স রুমে ঢুকিয়ে দিল। ভিতরে তখন একজন লোক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বকুল অপরাধীর মতো পিছনের দিকের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। বক্তা পুলিশকে আরও দায়িত্বশীল এবং নিরপেক্ষ কি করে করা যায় তা বলছিলেন। বকুল দেখল, ভদ্রলোকের সোল্ডার ব্যাজে 'সোর্ড অ্যাণ্ড ব্যাটন'-এর নীচে বি. এস. এফ লেখা। অর্থাৎ যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি বি. এস. এফ-এর ডি. জি.। তিনি বক্তৃতা দিয়ে বসতেই আরেকজন ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন, "নাউ উই ব্রেক ফর লাঞ্চ। আফটার লাঞ্চ উই শ্যাল অ্যাসেম্বল অ্যাট ওয়ান ফর্টি ফাইভ।" সকলে লাঞ্চ করতে চলে গেল। বকুল জয়েনিং রিপোর্ট সই করার জন্য কোর্স কো-অর্ডিনেটরের কাছে গেল। লাঞ্চ করে দেড়টার মধ্যে চেয়ারে বসল। কোর্স কো-অর্ডিনেটরের লোক এসে খাতাপত্র সমেত একটা ব্যাগ তার হাতে দিল। তাতে ট্রেনিঙের সময়সূচি ছিল। বকুল খুলে দেখল, পরের ক্লাসের টপিক্সের নাম 'ব্রেকিং দি আইস', এস. গুপ্তা। বকুল অপেক্ষা করতে লাগল।

পৌনে দুটোর সময় একগুচ্ছ কাগজ হাতে করে একজন ভদ্রমহিলা এলেন। এসেই কোনও কথা না বলে একেবারে সামনে বসে থাকা অংশগ্রহণকারীর হাতে কাগজগুলো ধরিয়ে দিয়ে বলল, "টেক ওয়ান অ্যাণ্ড পাস ইট টু আদার্স।"

কাগজের গুচ্ছটা এক সময় তার কাছেও এল। সে নিজে একটা নিয়ে পাশের লোকের হাতে দিয়ে দিল। মহিলা বললেন, "প্রথমে নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ে নিয়ে অনুভূতি সম্পর্কে বক্তব্যগুলি পড়ুন। তারপর আপনার উত্তর লিখুন। উত্তর ওখানে নয়। এই উত্তরপত্রে লিখুন।" মহিলা আরেক গুচ্ছ কাগজ বিলি করতে দিলেন। বকুল উত্তরপত্রটা নিয়ে উত্তর লিখে যেতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে অনেকেই শেষ হওয়ার সংকেত দিয়ে জানতে চাইল, "ইয়েস ম্যাম, এরপর।"

মহিলা বললেন, "১ থেকে ১০, প্রতিটি রো যোগ করুন। তারপর ১০টি রো-র যোগফলকে যোগ করুন।"

বকুলের তখনো শেষ হয়নি। তাড়াতাড়ি শেষ করে দেখল, ৫০টা উত্তর ৫টি কলম ও ১০ টি রো-তে সাজানো আছে। যোগ করল।

যোগ শেষ হলে মহিলা বলললেন, "হু হ্যাজ এ স্কোর মোর দ্যান এইট ইন রো ওয়ান? রেজ ইউর হ্যাণ্ড প্লিজ।"

আরও জনা চারেকের সঙ্গে বকুল হাত তুলল।

মহিলা একের-পর-একের নম্বর জানতে চাইলেন। প্রথমজন বলল, ১০। দ্বিতীয়জন ৯। তৃতীয়জন ১১। চতুর্থজন ১০। বকুল বলল, ১৮। মহিলা চমকে উঠলেন যেন। তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট ইজ ইওর স্কোর নি রো ফাইভ?"

বকুল বলল, "শূন্য।"

"তা কি করে হয়। রো সিক্স?"

"শূন্য।"

"হাউ ইজ ইট পসিব্‌ল? ইউ স্কোর্‌ড এইটিন ইন 'ইন্টার রোল ডিসট্যান্স', অ্যাণ্ড জিরো ইন বোথ 'রোল ওভারলোড' অ্যাণ্ড 'রোল আইসোলেশান'। হাউ ক্যান ইট বি।"

বকুল একটু বিব্রতবোধ করল। কিন্তু ভেবে দেখল, তার বিব্রতবোধ করার কোনও কারণ নেই। সে না বুঝে কোনও উত্তর লেখেনি। যোগে ভুল করেনি। নিজেকে সংযত করে উত্তর দিল, "ম্যাডাম আমি টেস্ট ডিজাইন করিনি। আমি মনোবিজ্ঞানীও নই। আমি একদম সঠিকভাবে, ভেবেচিন্তে উত্তর লিখেছি। যোগ করেছি। কি করে এ-রকম হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আপনার, আমার নয়।"

মহিলা নিজেকে সংযত করে জানতে চাইলেন, "আপনার মোট নম্বর কত?"

"৫২।"

"দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ এ নাইস ওয়াইফ।"

কথাটা খচ করে বকুলের বুকে লাগল।

মহিলা গিয়ে বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে অন্যদের স্কোর নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

মহিলা কি বলতে চাইছিল তা বোঝার জন্য বকুল মহিলার মুখের দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে পারল না। শুধু তার মুখে ক্লান্তির ছাপটা ফুটে উঠল।

বকুল মহিলার বয়স কত বোঝার চেষ্টা করল। প্রসাধন সত্ত্বেও চামড়ায় বয়সের ছাপ পরিস্কার। ৫০-৫৫ হবে। দেখলেই বিধ্বস্ত বুড়ি বুড়ি লাগছে। মনে হচ্ছে কর্মক্ষমতা আর বেশি বাকি নেই। বকুল ভাবার চেষ্টা করল, তার বয়সও তো ৫২ হল। তার মানে তাকে দেখেও নিশ্চয় অন্যদের এরকম মনে হয়। অথচ সে আগে কখনো এটা ভেবেই দেখেনি। সে শুধু কাজ করে গেছে। মনে হয়েছে, এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। চায়ের জন্য ক্লাস শেষ হতেই বকুল টয়লেটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। প্রতিদিনের দেখা মানুষটাকে যেন নতুন করে দেখতে পেল। সেই কলেজ-জীবনের ছবিটাকে পাশে দাঁড় করাতেই মনে হল, তারও বয়স হয়েছে। মুখের আদলটা ভেঙে গেছে। চামড়ায় টানটান ভাবটা আর নেই। মুখে ক্লান্তির একটা ছাপ পড়েছে। তাকে দেখলেও বুড়ো বুড়োই মনে হচ্ছে।

পরের দিন লাঞ্চ ব্রেকের সময় পিওন এসে বলল, "গুপ্তা ম্যাম আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাইছেন।"

"তিনি কোথায়?"

"তার চেম্বারেই আছেন। আপনার পক্ষে কি একবার যাওয়া সম্ভব হবে?"

বকুল তার পিছন পিছন যেতে লাগল।

পিওন চেম্বারের দরজা খুলতেই মহিলা চেয়ার থেকে উঠে আহ্বান করল, "ড. বিশ্বাস। আসুন, আসুন। বসুন।"

বকুল বসলে নিজেও বসে বললেন, "আপনার নম্বর নিয়ে প্রফেসর ভাসের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। তা তিনি তো আরও মারাত্মক খবর দিলেন। 'প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সারসাইজ'-এ শুনলাম আপনার গ্রুপের সদস্যরা বিচ্যুতির জন্য সব থেকে বেশি নম্বর পেলেও আপনার জন্য নাকি গ্রুপ সব থেকে কম বিচ্যুতি করেছে। কি করে ম্যানেজ করলেন।"

বকুলের মনে পড়ল, প্রথমে তার গ্রুপের সদস্যরা তার পদ্ধতি মানতে চায়নি। কিন্তু সে শেষপর্যন্ত যুক্তি দিয়ে মানিয়েছিল। সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা করে যখন দেখা গেল যে, তার ফলে তাদের কাজটায় বিচ্যুতি অনেক কম হয়েছে, একমাত্র তখনই তারা সন্তুষ্ট হয়েছিল। সেসব কথা না তুলে সে বলল, "আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো।"

"আমি আপনার স্কোরটা বুঝতে চাইছি। কি করে এ-রকমটা হল। আমার

সব কিরকম গোলমাল লাগছে।"

"যাতে গোলমাল না লাগে তার জন্য কি আমি কিছু করতে পারি?"

"আপনি কিছু মনে না করলে কয়েকটা প্রশ্ন করব।"

"করুন।"

"আপনার ছেলেমেয়ে কজন?"

"আমার কোনও ছেলেমেয়ে নেই।"

"আপনার স্ত্রী কি করেন?"

"আমার স্ত্রী নেই।"

"সরি, সরি। বিয়ে করেননি?"

"করেছিলাম।"

"তাহলে?"

"আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

"ভেরি সরি। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে, কেন?"

"আমার সঙ্গে থাকার থেকে আমাকে ছেড়ে ভালো থাকবে বলে।"

"বিয়ের আগে বা পরে কি আপনার কোনও অ্যাফেয়ার ছিল?"

"বিয়ের আগে একটি মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল।"

"তো, তাকে বিয়ে করলেন না কেন?"

"সে অন্য কাউকে বিয়ে করে নিয়েছিল।"

"আপনি কিছু বলেননি।"

"না।"

"কেন?"

"ও অন্য কাউকে বিয়ে করলে কি হবে, এরকম কোনও শর্ত ছিল না।"

"কি শর্ত ছিল?"

বকুল বলবে কি না একবার ভাবল। আবার বলে ফেলল, "আমি কাউকে বিয়ে করলে ও খুন করে ফেলবে।"

কথাটা শুনেই মহিলা একটু চমকে উঠলেন। কি যেন খুঁজলেন। তারপর জানতে চাইলেন, "ড. বি বিশ্বাস পুরোটা কি বকুল বিশ্বাস?"

"সেটা তো তালিকাতেই আছে।"

"আপনার বাড়ি মকসুদাবাদে। আপনি কে. এন কলেজে পড়তেন।"

"আপনি কি করে জানলেন।"

"জানলাম এই জন্য যে, যে মেয়েটি খুন করতে চেয়েছিল সে আমি।"

এবার বকুল চমকে উঠল। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। চোখ, মুখ, ভঙ্গিমা, কিছুই যে স্নিগ্ধার মতো নয়। তাই সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি স্নিগ্ধা?"

"ততটা স্নিগ্ধ নই, তাই তো? তবু, আমি সেই স্নিগ্ধা মুখার্জি। বিয়ের পর স্নিগ্ধা গুপ্তা। এখন প্রফেসার এস. গুপ্তা।"

"তোর স্বামী তো পি এণ্ড জি-তে এক্সিকিউটিভ ছিলেন শুনেছিলাম?"

"এখন ইউনি লিভারে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে। আমি বি. টেক করেই ওর সঙ্গে ওখান থেকে চলে এসেছিলাম। এম. বি. এ. করে ওদের কোম্পানিতেই ঢুকেছিলাম। কিছুদিন করে ভালো লাগল না। তাই ছেড়ে দিয়ে টিচিং-এ চলে এলাম। সেও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। ওরা আমাকে প্রফেসর করে দিয়েছে। তোর কথা বল্।"

"আমার সব কথাই তো বলা হয়ে গেছে। এখন কি করছি, তাও দেখছিস। আর কিছু বলার নেই।"

"কতদিন পর দেখা বল্। সেই পঁচাত্তর সালে অনার্স পাস করেছি। ৩০ বছর হয়ে গেল। তুই আজ রাতে আমার বাড়িতে ডিনার কর।"

"তুই বরং তোর বরকে নিয়ে বঙ্গভবনে চলে আয়। রান্না খুব খারাপ করে না।"

"যতই করুক, বাড়ি আর গেস্টহাউসের তুলনা হয়? তুই সন্ধ্যেবেলায় চলে আয়।" সে কার্ড বের করে বলল, "ওয়াকিল লেনে, একদম তোর বঙ্গভবনের কাছেই। পায়ে হেঁটে চলে আসতে পারবি।"

বকুলের মনে হল, লেনের নামটা যেন সে দেখেছে। বঙ্গভবনের কাছেই বটে। রাজি হয়ে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে দেখল, প্রফেসার গুপ্তা তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। একটুখানি আলাপ-অলোচনার পরই টেবিলের ওপর খাবার সাজাতে লাগল।

বকুল বলল, "তোর স্বামীকে দেখছি না। তিনি কি এখনো ফেরেননি?"

"তিনি এখানে থাকেন না।"

বকুল তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল।

"বিয়ের পর ব্যাঙ্গালোরে চলে যাই। ওর দিল্লিতে বদলি হলে আমিও

বদলি নিই। কিন্তু তারপর যখন ও মুম্বাই গেল তখন আমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব হয়ে গেছে। আমি আর যাইনি। ও-ও আসেনি। তারপর এখন তো নিউ ইয়র্কে। আমি ঠিক করেছি, একাই থাকব।"

"তোদের কি ডিভোর্স হয়ে গেছে?"

"না। কাউকে আবার বিয়ে করব, এরকম ভাবিনি। ডিভোর্সও নিইনি। তুই?"

"যখন সে আমাকে ছেড়েই চলে যেতে চেয়েছে আমি আর আইনের বাঁধনটা ধরে রাখিনি। ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছি।"

"তাহলে আর বিয়ে করিসনি কেন?"

"সম্ভব হয়নি।"

"তাহলে ডিভোর্স নিতে গেলি কেন?"

"ও-সম্পর্ক আর রাখা যায় না বলে।"

"আবার নতুন সম্পর্ক কর।"

"আমি আর সেসব কিছু ভাবছি না। তুই চাইলে, তোর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারি।"

"থাক। সেটার আর দরকার নেই।"

মুখোশ

চিফ রিপোর্টার ডেকে বলল, "ভবেন! তোকে একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি।"

ভবেন বুঝল যে, এবার কোপটা পড়বে। জেনেও তাকে বলির পাঁঠার মতো গলাটা বাড়িয়ে দিতে হবে। বলল, "কোন অ্যাসাইমেন্ট, সমিতদা?"

"শাসক দলের বড় নেতা, ভজহরি আচার্য পুনিশোল যাচ্ছেন। ট্যুরটা তোকে কভার করতে হবে।"

"কেন সমিতদা? ওটা তো ধ্রুবজ্যোতিদাকে অ্যাসাইন করা হয়েছিল।"

"হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সি. এমের মিটিং পড়ে গেল। ওটা কভার করতে হবে না?"

"সেটা আমাকে দিতেন।"

"দিতাম, যদি কর্তার সে-রকম ইচ্ছে হত।"

ভবেন দেখেছে, এদের এই এক দোষ। সুবিধা মতো এরা কখনো কর্তা, কখনো-বা হর্তকর্তার নাম নেবে। কর্তার সত্যি সে-রকম ইচ্ছে কি না, তা তার পক্ষে যাঁচাই করে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তার কিছু বলার ছিল না। তবে মুখে বিরক্তিটা ফুটে উঠে থাকবে।

সমিত বলল, "বিরক্ত হচ্ছিস কেন? অন্য কাউকে দিলে এ -প্রস্তাব লুফে নিত।"

ভবেনের ইচ্ছে হল, বলে, "তবে আমাকে কেন? দাও না তাদের কাউকে।" মুখে বলল, "কেন সমিতদা?"

অমিত বলল, "মাদ্রাসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি একটা বলেছিলেন। তা নিয়ে সংখ্যালঘুরা অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। সামনে ভোট। বিরোধীরা ঘোট পাকাচ্ছে। আচার্য যাচ্ছেন, তাদের বোঝাতে যে, শাসক দল সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয়।"

ভবেনের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল, অত ভোটের ভয় তো পাঁয়তারা কষতে যাও কেন? আর যদি পাঁয়তারাই কষো তো ভোটের জন্য উলটো

গাওয়া কেন? তোমরা না সব নীতিনিষ্ঠ দল! মুখে বলল, "তার জন্য তো আলিম সাহেবের মতো কিছু ধামাধরা রাখা আছে। তারা মুসলমানদের বোঝানোরও চেষ্টা করেছে, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিক ও-কথা বলতে চাননি।'"

সমিত বলল, "কিন্তু মুসলমানরা তো তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হননি।"

"কি করে হবে? মুখ্যমন্ত্রী যে ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন, তা তো তিনি বলতে পারেননি।"

"সেইজন্যই তো আচার্যবাবু যাচ্ছেন। বুঝিয়ে বলবেন। আমাদেরও একটু গুছিয়ে লিখতে হবে। না হলে ভোটের সময় ..."

"ভোটগুলো বিরোধীদের দিকে গেলে শাসকদলের সমূহ বিপদ। তাঁরা বুঝিয়ে বলুক। কিন্তু আমাদের গুছিয়ে লিখতে হবে কেন? আমরা না নিরপেক্ষ?"

"ভবেন! তোকে নিয়ে এই এক বিপদ। এতদিন কাজ করলি। কাগজের লাইনটা বুঝলি না।"

ভবেনের নিজেরও মনে হয়, সে লাইনটা কিছুতেই বুঝতে পারে না।

সে সাধারণ দরিদ্র ঘরের ছেলে। অর্থাভাবে স্কুলে পড়া ছিল কষ্টকর। বর্তমান শাসক দল তখন বিরোধী দল। তাদের নেতারা গরিব মানুষের পক্ষে কথা বলত। সে কথার টানে সে-দলের ছাত্র সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। ভালো বক্তৃতা করত বলে তাড়াতাড়ি নেতাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লাইনটা বুঝতে পারেনি। রাজ্যস্তরের নির্বাচনের সময় বলেছিল, "ছাত্র সংগঠনের নেতা কোনও ছাত্রেরই হওয়া উচিত। রণদা বিশ বছর আগে পাঠ শেষ করেছেন। এখন চাকরিও করছেন। উনি কেন ছাত্রদের নেতা থাকবেন?"

তার সে মতো প্রগতিশীল নেতারা মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের বক্তব্য, "ছাত্র সংগঠনের নেতাকে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রায় কোনও ছাত্রই ততটা পরিণতবুদ্ধি নয়। ফলে সিদ্ধান্তে ভুল হতে পারে। পার্টি লাইনের বাইরে চলে যেতে পারে। তা যাতে না হয়, তার জন্যই পরিণতবুদ্ধিদের নেতৃত্বে থাকা দরকার।"

সে-ও তাঁদের কথা মেনে নিতে পারেনি। সরে এসেছিল। তারপর পাশ করে এই কাগজে যোগ দিয়েছিল। সেই কাগজের লাইনও সে বুঝতে পারে না। কর্তারা মুখে দাবি করেন, "তাঁরা নিরপেক্ষ।" কিন্তু লিখতে বলে কারও পক্ষে। যেমন এখন বলছে, শাসক দলকে যাতে মুসলমানরা ভোট দেয় তেমন করে লিখতে। এটা কিরকম নিরপেক্ষতা? আর এটা তার কিরকম

সাংবাদিকের স্বাধীনতা? সে সেই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিল।

সমিত বলে চলল, "যাক। এখন-ও সব আলোচনার সময় নেই। ভোলাদার গাড়ি অ্যালট করা আছে। তুই রওনা হয়ে যা। রিপোর্টটা একটু ভালো করে লিখিস। পরে কথা বলব।"

ভবেনের আর কিছু বলার ছিল না। সে ব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে গ্যারেজের দিকে রওনা দিল।

গাড়ির কাছে এসে দেখল, গাড়ির দরজা খোলা। আর ভোলানাথ ভাদুড়ি গাড়ির ইঞ্জিনের ডালা খুলে কি সব খুটখাট করছে।

ভবেন কাঁধের ব্যাগটা পিছনের সিটে রেখে বলল, "ভোলাদা! জলদি করো। দেরি হয়ে যাবে।"

ভোলা এমন ভাব করল যেন, সে ভবেনের কথা শোনার প্রয়োজনই মনে করল না। ভবেনের দিকে ফিরে না তাকিয়ে সে সামনের গাড়ির ড্রয়ার থেকে একটা লাল কাপড় বের করে আবার সামনে চলে গেল। কাপড়টাকে গাড়ির নিচে বিছিয়ে চিৎ হয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

ভোলার তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার ভবেনের একদমই ভালো লাগছিল না। সে বলল, "ভোলাদা! কিছু করার থাকলে পরে করো। এখন চলো। না হলে দেরি হয়ে যাবে।"

ভবেনের তাড়া দেওয়াও ভোলার ভালো লাগছিল না। গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে তার মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছিল। ভবেনের তাগাদায় তা আরও বিগড়ে গেল। সে মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "দেরি হইলে হইবো। চুপচাপ বহেন। নইলে অন্য গাড়ি দ্যাহেন। গাড়ির অ্যাক্সেল ডাউন হইয়া গ্যাছে গিয়া। গ্যারেজ যাইবার পড়বো।"

ভোলার কথা শুনে ভবেনেরও মেজাজ বিগড়ে গেল। সে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সোজা সমিতের সামনে হাজির হল।

সমিত সব শুনে প্রমাদ গুণল। এ-প্রোগ্রাম ফেল হলে বসের কাছে ফোন আসবে। বস ক্ষেপে লাল হবে। তাতে তার চাকরি রাখা ভার হবে। সে তাড়াতাড়ি যানবিভাগে ফোন করল। ফোন বেজে গেল। ফোন ছেড়ে সে বেল বাজাল। ঘরের পিওন এসে দাঁড়াতে বলল, "প্রদীপ! একবার দৌড়ে গিয়ে দেখ তো, এম. টি. ও ঘরে আছে কি না।"

প্রদীপ এম. টি. ও কে তা না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

সমিত অধৈর্য হয়ে বলল, "সুশোভনদারে, সুশোভন সোম।"

প্রদীপ আরও অসহায় বোধ করল।

সমিত গলা চড়িয়ে বলল, "ওই যে রে, অ্যাকাউন্ট্স সেকশানের পিছে বসে। গাড়ি দেখাশুনা করে।"

প্রদীপ যেন জ্বলে উঠে বলল, "ও মটরবাবু? তো তাই বুলেন! তা বারবার এম. টি. ও-এম. টি. ও করছেন ক্যানে?"'

"ক্যান করছি পরে বুলব। তুই এখন যা। সেখান থেকে পারিস মটরবাবুকে ধরে লিয়ে আয়।"

প্রদীপ বেরিয়ে গেল।

সমিত একগাদা অস্বস্তি নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সুশোভন এসে দাঁড়াতেই বলল, "ভবেন বলছে, ভোলার গাড়ির অ্যাক্সেল ডাউন। আচার্য সাহেবের অ্যাসাইমেন্ট। দেরি হলে কিচাইন হয়ে যাবে। ভবেনকে একটা গাড়ি দাও।"

সুশোভন একেবারে হাত তুলে দিল, "সব বিটে বেরিয়ে গেছে। আর তো একটাও গাড়ি নাই।"

সমিত মরিয়া হয়ে বলল, "কেন স্ট্যাণ্ডবাইটা দাও। তোমার একটা গাড়ি তো সবসময় স্ট্যাণ্ডবাই থাকে।"

"সেটা তো সি. এম. অ্যাসাইমেন্টে বস দিয়ে দিতে বলল।"

"আর এমার্জেন্সীটা?"

"ওটা তো অমলদা মেমসাহেবের কাছে পাঠাতে বলল।"

"তাহলে কি হবে?" সমিত ভাবতে লাগল। টেবিলের চারপাশে একবার পায়চারি করল। তারপর ভবেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভবেন, একটু আমার সঙ্গে আয় তো।" বলেই সে সম্পাদকের ঘরের দিকে ছুটল।

ভবেন তার পিছন পিছন চলল।

ঘরে ঢুকেই সমিত বলল, 'গোপালদা! ভবেনকে আচার্য সাহেবের ট্যুরটা কভার করতে বলা হয়েছিল। ভোলার গাড়িটা অ্যালট করা হয়েছিল। তা সেটা অ্যাক্সেল ডাউন হয়ে পড়ে আছে। কি করব?"

গোপাল পাল শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সুশোভনকে জিজ্ঞেস করো, কেন গাড়িগুলো ঠিক সময়ে দেখেনা!"

সমিত দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভবেন।

গোপাল বলল, "ও-সব পরে দেখো। আপাতত একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নাও। কোথা থেকে ভাড়া করবে।"

"মেট্রো কারে ফোন করব।"

"করবে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠালে ঠিক আছে। কিন্তু যদি আসতে দেরি করে? কি হবে?"

সমিত, ভবেন, দুজনেই নিরুত্তর থাকল।

গোপাল ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। রিসিভারটা মুখের কাছে নিয়ে বলল, "কে? ভজহরিবাবু বলছেন? ... হ্যা, আপনার প্রোগ্রামটা কভার করার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে। ওর গাড়িটা একটু খারাপ হয়েছে। ... একটুখানি দেরি হবে। ... না-না, তাতে অসুবিধা হবে না। বরং যেতে যেতে আপনার কাছ থেকে ভালোভাবে জেনে নিয়ে ভালোভাবে লিখতে পারে। ... আমি বলে দিচ্ছি।"

ফোনটা রেখে গোপাল সমিতকে বলল, "আচার্য বলছেন, ভবেন ওঁর গাড়িতেই চলে যাক। দেখো, পৌঁছে দাও। তারপর সুশোভনকে ডাকো।"

সমিত ভবেনকে নিয়ে নিজের চোয়ারে ফিরে এল।

সুশোভন তখনো অপেক্ষা করছিল।

সমিত তাকে বলল, "স্ট্যান্ডবাই গাড়িটা ভবেনকে আচার্যবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেবে। তারপর ধ্রুবজ্যোতিকে নিয়ে বেরুবে। আর এই বন্দোবস্তোটা করে তুমি একবার বসের সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। ভোলার গাড়ি খারাপ হওয়ার কথাটা বস ভালোভাবে নেয়নি।

সুশোভন কিছু না বলে ইশারায় ভবেনকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

২

আচার্যবাবুর ঘরে পৌঁছে ভবেনের একটু ভালো লাগল। শাসকদলের একদম ওপরের সারির নেতা। কিন্তু কত সাধারণ একটা ঘরে থাকেন। ঘরের মলিন চেহারা আর আসবাবপত্রের দৈন্যদশা প্রকাশ করছে, ঘরের মালিক ধনী লোক নন। দেশের নেতাদের তো এমনিই আদর্শবাদী আর সৎ হওয়া দরকার। সে এই দায়িত্বটা নিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু তাকে জোর করে পাঠিয়ে ভালোই করেছে। না হলে, শাসক দলে এখনো যে এ-রকম লোক আছে তা তার জানা হত না। মনের ভাবটা সে গোপন রাখতে পারল

না। তাজা খবরের সন্তোষ কুণ্ডুর কাছে তার মতটা প্রকাশ করেই ফেলল।

কুণ্ডুদা মুচকি হেসে বলল, "তুইও যেমন। এটা একটা ভড়ং। সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য। ভজহরি আচার্য কত টাকার মালিক, তুই জানিস?"

ভবেনের বিশ্বাস হচ্ছিল না। অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল, "কত টাকার?"

"লাখ লাখ টাকার। তথ্যকেন্দ্রের কাছে যে-বাড়িটা আছে শুধু তার দামই হবে কোটিখানেক। রথতলাতে আরেকটা বাড়ি আছে। নামে-বেনামে ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে জানিস?"

"বেনামে কেন?"

"আয়ের সূত্র কোথায় যে, নামে রাখবে। পার্টির যে ভাতা তাতে তো খাওয়া-পরাই চলে না। এতসব বাড়ি-গাড়ি কোথায় থেকে আসে?"

"কোথা থেকে আসে কুণ্ডুদা?"

"শুধু এটুকু বলতে পারি, সততা থেকে নয়।"

"আচ্ছা, তাহলে বাড়িগুলো কার নামে আছে?"

"ছেলে, মেয়ে, বা নিকট আত্মীয় কারও নামে হবে। বাড়ির পোষা কুকুরের নামেও হতে পারে। কেন? তুই ইন্‌ভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করতে চাস না কি? তোর কাগজে ছাপা হবে। তোরা তো একেবারে রুলিং-পার্টির চামচে হয়ে গিয়েছিস।"

তার কাগজের কর্তা ব্যক্তিদের প্রতি ভবেনের তেমন কোনও শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কুণ্ডুদা এমনভাবে বললেন যে, সেটা তার ভালো লাগল না। সে বলল, "কুণ্ডুদা! ছাপা হবে কি না, সে প্রশ্ন পরে উঠবে। আগে তো প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি যা বলছেন তা সত্যি।"

"দেখতে চাইলে আমার সাথে চল্। দেখবি, ভজহরি ওখানেই আছে। এরপর আরও যদি কিছু জানতে চাস তো পৌরসভার রেকর্ড দেখলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি যা বলছি তা ঠিক কি না।"

"দেখান, আমি সত্যি দেখতে চাই।"

"তাহলে চল্। ভজহরি এখনো নিশ্চয় বের হয়নি।"

ভবেন কুণ্ডুদার পিছন পিছন এসে তার গাড়িতে উঠল।

তথ্যকেন্দ্রের কাছে প্রাসাদের মতো বাড়িটির সামনে এসে গাড়ি থামল।

কুণ্ডুদা ভবেনকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকছিল।

একজন লোক এসে জানতে চাইল, "আপনার কখন অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে।"

কুণ্ডুদা কি বলবে তাই ভাবছিল।

লোকটি আপত্তির সুরে বলল,"স্যার তো অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করেন না।"

কুণ্ডুদা বলল,"প্রগতিশীল থেকে আসছে। ভজহরিবাবুর সঙ্গে তার ট্যুর কভার করতে আসতে বলেছেন।"

"তার জন্য তো এখানে আসার দরকার ছিল না। স্যার তো ওখান হয়েই যাবেন।"

"কিন্তু প্রগতিশীলের সম্পাদকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভজহরিবাবু একে নিজের গাড়িতে নিয়ে যাবেন বলেছেন।"

"গোপালবাবু পাঠিয়েছেন? তাহলে ঠিক আছে। ওপরে বসুন। আমি স্যারকে খবর দিচ্ছি।"

ভবেন কুণ্ডুদার সঙ্গে ওপরের ঘরের জন্য পা বাড়াল।

ভবেন দেখল, বিরাট প্রাসাদ। সত্যিই সুন্দর। অভিজাত। ঘরের প্রতিটি সামগ্রী মূল্যবান। দেওয়ালে বহু মূল্যবান ছবি। চারপাশে বিলাসিতার ছড়াছড়ি। প্রচুর্যের বাড়াবাড়ি। এত প্রাচুর্যের বাড়াবাড়ি পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মীর হয় কি করে? সৎপথে তো হতে পারে না। বাড়িটা কার নামে আছে সে বের করে কাগজে লিখবে। অবশ্য কোনও লেখাতেই এদের গায়ে কিছু যায় আসে না। দুর্নীতি এখন এদের কাছে তেমন আপত্তিজনক ব্যাপারই নয়। অনেকেই দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে। তবু সে লিখবে। তার কাজ সে করবে।

৩

ভজহরিবাবু এসে বলল, "ভবেন কে আছেন?"

ভবেন উঠে দাঁড়াল। দেখল, একজন ধনী, সুখী-সুখী মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। অভিজাত পোশাক। দামী সেন্টের গন্ধ।

ভজহরি বলল, "গোপালবাবু আপনাকে এখানেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে চলুন। আমার গাড়িতে উঠে পড়ুন।"

কুণ্ডুদা ইশারা করল।

ভবেন ভজহরির গাড়িতে উঠে গেল।

পুনিশোলের খানিকটা দূরেই মিছিল চোখে পড়ল। ভজহরি গায়ের পাটকরা পাঞ্জাবিটা খুলে রাখল। তারপর গেঞ্জিটাও খুলে ফেলল। ব্যাগ থেকে একটা ছেড়া গেঞ্জি বের করে পরে নিল। তারপর অরগ্যান্ডির একটা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে নিয়ে সামনের সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করল, "গেঞ্জিটা যে ছেঁড়া তা বোঝা যাচ্ছে তো?"

সিকিউরিটি বলল, "দেখা যাচ্ছে স্যার। তবে পাঞ্জাবিটা একটু ছেঁড়া হলে আরও ভালো হত!"

"তা অল্প করে একটু ছিঁড়ে দে। যে দেবতা যে ফুলে খুশি।" বলে সে নিজে নিজেই বুকের কাছটা একটু ছিঁড়ে নিল।

ভবেনের আর ভালো লাগছিল না। তার মুখে গরিবের জন্য দুঃখের এবং বড়লোকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা তার সহ্য হচ্ছিল না। তবুও তার বক্তৃতা শুনল। নোটও নিল।

সভা শেষে ভজহরি ভবেনকে ডেকে পাঠাল।

ভবেনের আর তার গাড়িতে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সে বলল, "স্যার, আমি এক্ষুনি রিপোর্টটা লিখে ফ্যাক্স করে দেব। ওখানে গিয়ে লিখতে হলে দেরি হয়ে যাবে। আগামী কাল নাও বেরুতে পারে। আমি ফ্যাক্স করার পর রওনা হব। শুনলাম নটার দিকে এখান থেকে একটা বাস আছে। আমি ঠিক চলে যাব।"

ওপাশ থেকে কুণ্ডুদা এসে বলল, "কিরে? একদিনেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল? এখনো কিছুই দেখিসনি।"

ভবেন কিছু না বলেই দাঁড়িয়েছিল।

কুণ্ডুদা বলল, "চল্। এখানকার নীলকণ্ঠ মন্দির খুব বিখ্যাত। শিবের মতো নিস্পৃহ সর্বংসহা দেবতা আর হয় না। দেখ, জগৎকে বাঁচাতে সাগরমন্থনের সবটুকু গরল পান করে কেমন নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছেন। আবার ওই শিবই যখন নটরাজ হয়, বল্? চল্, মনটা একটু শান্ত হবে।"

ঠাকুর-দেবতায় ভবেনের কোনওদিনই বিশ্বাস ছিল না। ভবেন জানে, নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য এ-সব মানুষেরই সৃষ্টি। আজ তবুও কুণ্ডুদার সঙ্গে নীলকণ্ঠ মন্দিরে গেল।

৪

মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুণ্ডুদা ভক্তিভরে প্রণাম করল। ভবেন দেখল, তাতে মূর্তির কোনও ভাবান্তর হল না। পিছনে গাড়ির শব্দ হল। ভবেন ফিরে তাকিয়ে দেখল, গরদের শাড়ি পরা কোনও ধনী মহিলা গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গের লোকেরা ধ্বনি দিল, 'ভোলেবাবা, পার করেগা।' সে-ধ্বনির টানে কণ্ডুদাও ফিরে তাকাল। দেখে বলল, "অভিনেত্রী, ছন্দা সাহা। এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী। কিন্তু খুব ধার্মিক, সজ্জন মহিলা।"

পাশে একটা ভিখারী মতো ছেলে বসেছিল। সে প্রতিবাদ করে বলল, "সজ্জন না ছাই!"

ভবেন, কুণ্ডুদা, দুজনেই তার দিকে তাকাল।

সে বলে চলল, "সজ্জন না ছাই! এক নম্বরের চিপ্পুস। আমাদের হাতে একটা পয়সা দেয় না। পাথরের ওপর দুধ ঢালে। ওতে কি আর মনোস্কামনা ফলে?"

ভিক্ষুকের এহেন কথা শুনে ভবেন আশ্চর্য হয়ে গেল।

তারও এ-রকমই মনে হয়। টিভিতে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান দেখছিল। পুরোহিতরা কলসী কলসী দৈ কৃষ্ণের মূর্তির ওপর ঢালছিল। ভবেনের মনে হচ্ছিল, কি বিরাট অপচয়! দেশের অনেক লোক খেতে পায় না। আর সুস্বাদু খাদ্যের এ-রকম অপচয়। এগুলো যদি তাদের দেওয়া হত, তারা খেয়ে তৃপ্ত হত। তা না করে পাথরের মূর্তির ওপর ঢালছে। এতে শুধু জায়গাটা আরও নোংরা হচ্ছে। এতে পূণ্য কি করে হয়?

ততক্ষণে ছন্দ সাহা কাছে চলে এসেছিল। ভিখারী ছেলেমেয়েগুলো হাত পেতে ভিক্ষার সঙ্গীত শুরু করেছিল। শুধু সেই ছেলেটা হাত বাড়ায়নি। বোধহয় তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে। সে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। অন্যরা সমবেত সঙ্গীত গাইছিল। ভবেনও কুণ্ডুদার সঙ্গে সরে দাঁড়াল।

মহিলা মূর্তির কাছে গিয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে দাঁড়াল। সাথের পুরোহিত মন্ত্র পড়ল। একজন সঙ্গী তার হাতে একটা কলসী দিল। ছন্দা সেটা কাৎ করতে মূর্তির মাথায় দুধ গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভবেনের মনে হল, দুধটা এই অনাহার-ক্লিষ্ট ভিখারীগুলোকে দিলেও খেত পারত। মূর্তি বেয়ে নোংরা ড্রেনে চলে গেল।

রুচিহীন

কামাল অফিসে ঢুকতেই ফোনটা বেজে উঠল। ধরতেই ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "দাদা নমস্কার! আমি সুরিন্দার বলছি।"

সুরিন্দার রাজধানী থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত হিন্দি দৈনিক সন্মার্গের সাংবাদিক। কামাল যখন রাজধানীর পুলিশে ছিল তখন আলাপ হয়েছিল। সৎ এবং স্পষ্টবক্তা। তাই এখনো সম্পর্ক আছে।

কামাল বলল, "নমস্কার। আপ ক্যায়সে হ্যাঁয়?"

সুরিন্দার বলল, "বিলকুল ঠিক হু দাদা। আপনি ভালো আছেন?"

"ভালো আছি। বলুন।"

"দাদা! লালপুলিশ সংগঠনের কাগজে আপনি ঠিক কি লিখেছেন যে, তা নিয়ে এত হইচই হচ্ছে?"

"আপনি কি লেখাটা পড়েছেন?"

"না দাদা। জোগাড় করতে পারিনি।"

"পুলিশের সংগঠনের মুখপত্রে লেখা। আপনি অনেক দিন পুলিশ বিট করেছেন তো। তারা কেউ দিতে পারল না?"

"না দাদা। যাকে বলছি, সেই বলছে, পাওয়া যাচ্ছে না। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় দেখলাম, সব কপি নাকি তুলে নিয়েছে।"

"হ্যাঁ, রিপোর্টটা আমিও দেখেছি। সত্যি কি না জানি না। তবে এটা ঠিক যে, পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সেজন্য আপনাকেই ফোন করলাম দাদা। ঠিক কি লিখেছেন?

"পুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব বিষয় নিয়ে প্রবন্ধটিতে আলোচনা আছে।"

"যেমন?"

"যেমন পুলিশের কাজ কি, পুলিশে নিয়োগ কোনও পদে কিভাবে করা হয়, পুলিশের কাদের কি রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, পুলিশের ভাবমূর্তি

এত খারাপ কেন, পুলিশের দুর্নীতির কারণ, সে দুর্নীতি দূর করতে হলে কি করতে হবে, ইত্যাদি।"

"তাহলে লালপার্টির লোকেরা এত উলটো-পালটা বিবৃতি দিচ্ছেন কেন?

"সত্যিকার কারণটা তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে আমার ধারণা, তাঁরা প্রবন্ধটা নিজে পড়েণনি। কোনও সাংবাদিক তার নিজের পছন্দ মতো কিছু জিজ্ঞেস করছেন। আর তাঁরা আমি সত্যিকার কি লিখেছি তা না জেনেই ফুটবলের মতো নাচতে শুরু করছেন।

"আপনি মিডিয়ার কাছে কিছু বলছেন না কেন? তাহলে তো ব্যাপারটা পরিস্কার হত।"

"বলার অসুবিধা এই যে, আমি যা বলব, আর আপনারা যা প্রকাশ করবেন তা ঠিক এক নাও থাকতে পারে। তাতে বিভ্রান্তি আরও বাড়বে।"

"না দাদা, আপনার বক্তব্য কেউ বিকৃত করবে না।"

"ইচ্ছে করে বিকৃত করবে, তা আমি বলছি না।"

"তাহলে?"

"কোনও বিষয়কে দেখার জন্য প্রায় প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। কোনও বক্তব্য শোনার সময় সেই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ফলে একই বক্তব্য একেকজনের কাছে একেক রকম প্রতিভাত হয়। যে-অংশটা তাকে বেশি আকৃষ্ট করে সে-অংশটা ভালোভাবে মনে থাকে। প্রকাশ করার সময় আবার দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ফলে দেখবেন, একই প্রেস-কনফারেন্স শুনে আপনারা একেকজন একেকরকম প্রতিবেদন লেখেন। তাতে যেমন মিল থাকে, তেমনি অমিলও থাকে।"

"তাহলে লিখলেন কেন?"

"হ্যাঁ, আমার লেখাকেও একেকজন একেকভাবে উপস্থাপিত করছেন। কিন্তু তাতে আমার লেখাটার অস্তিত্ব বিকৃত হচ্ছে না। আর তা হচ্ছে না বলেই, আমি যা বলতে চাইনি, তার দায় এড়াতে পারছি। বিবৃতি বিকৃত হয়ে যায় বলে এড়াতে অসুবিধা হয়।"

সুরিন্দার একটু থেমে বলল, "তাহলে দাদা, আপনি লিখেই জানান।"

প্রস্তাবটা কামালের মন্দ মনে হল না। সে লিখবে। প্রবন্ধটাও তো এমনি একটা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই লিখেছিল।

২

লালপুলিশ সংগঠনের সভাপতি স্বাধীন বিশ্বাস একদিন কামালের সঙ্গে দেখা করে তাদের মুখপত্রে লেখার জন্য অনুরোধ করল। চিঠিও পাঠাল। তারপর নিজে ও তার সংগঠনের লোকেরা বারবার ফোন করতে থাকল। প্রবন্ধের অনুরোধ 'পুলিশ প্রসঙ্গে।' সময়ের অভাব সত্ত্বেও লেখায় হাত দিল। উদ্দেশ্য একটাই, সে নিজে যে-বিভাগে কাজ করে তাকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছ, সৎ ও নিরপেক্ষ করে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা।

তার পুলিশে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যও তাই ছিল। সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল, ৭৪৭ জনের তালিকায় তার নাম ১৪৮। তার প্রথম-দ্বিতীয় পছন্দ আই. এ. এস-আই. এফ. এস-এ শূন্যপদ ১৫০। তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ থাকায় মেধা তালিকায় যারা ৫০০-৬০০-তে আছে তারাও তার আগে চলে আসবে। ১৫০-এর মধ্যে থেকেও সে বেরিয়ে যাবে। কাজেই পরের পছন্দ নিতে হবে। তার প্রায় সব বন্ধুবান্ধবই পুলিশে ঢোকার বিরুদ্ধে ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, পুলিশে ঢুকলে সে অসৎ হয়ে যাব। শুধু তার কলেজ শিক্ষক ডক্টর আশিষ চ্যাটার্জি বলেছিলেন, "তাহলে কি পুলিশে ভালো লোক যাবে না? পুলিশ কোনওদিনই ভালো হবে না? তুমি পুলিশে যাবে। নিজে ভালো থাকবে। পুলিশকেও ভালো করবে। সেইটাই তো চ্যালেঞ্জ। স্বাধীন দেশের পুলিশ জনগণের পুলিশ হবে। অসৎ কেন হবে?" কথাগুলো কামালের ভালো লেগেছিল। আই. পি. এস-ই নিয়েছিল।

ছাত্রজীবন থেকে তার রাজনৈতিক সচেতনতাও এ-ব্যাপারে তার পথ বেঁধে দিয়েছিল। সে যখন ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তরের দশকের শুরুতে স্কুলের ওপরের ক্লাসে পড়ে তখন তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নাজির আহমেদ লালপার্টি করতেন। নাতি লাল, লাল-এর পার্থক্য তখনো সে বুঝত না। নীলপার্টির নাম শুনেছিল। কিন্তু নীলপার্টির কোনও নেতা তাদের স্কুলে ছিলেন না। আহমেদ সাহেব তার মতো অনেককেই বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, নীলপার্টি বড়োলোকদের পার্টি। আর লালপার্টি গরিব মানুষের পার্টি। তিনি তাদের গ্রামেও যেতেন এবং বাবা মাদের সঙ্গেও কথা বলতেন। বলা বাহুল্য সে গরিব ঘরে জন্মেছিল। অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে অসুবিধা হত। সময়ে বই কিনতে পারত না। পায়ে চটি দূর অস্ত, গায়ে দেওয়ার মতো

জামাও জুটত না। তার বাবার সামান্য দুয়েক বিঘে জমি ছিল। আরও কয়েক বিঘে জমি ভাগে চাষ করতেন। অন্যের জমিতে মজুর হিসেবে কাজও করতেন। তার যেটা খারাপ লাগত, তার বাবা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতেন। কিন্তু তাদের দুবেলা খাবার জুটত না। কিন্তু যাঁরা জমির মালিক তাঁরা কেউ চাকরি করতেন, কেউ ব্যবসা করতেন। তাঁদের জমি কোথ. আছে সেটা তাঁরা জানতেনও না। কিন্তু কোনও অফিসের কোনও কাগজে তাঁদের নাম লেখা আছে বলে ফসলের ভাগ তাঁদের দিয়ে আসতে হত। তার মনে হত, এটা অন্যায় নিয়ম। সেজন্য লালপার্টির নেতারা যখন স্লোগান দিতেন 'লাঙ্গল যার জমি তার' সে স্লোগান তাকে টানত। ওঁদের ডাকে সে সাড়া দিত। গ্রামে মিটিং করত। মিছিল করে নীলগঞ্জে যেত। পরবর্তীকালে যখন কলেজে এল তখন দারিদ্র আরও রূঢ়ভাবে জীবনে এসেছে। তখন তার মনে হত লালপার্টি বা অন্যান্য দলগুলো সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট করছে না। সেই জায়গায় অতিলালপার্টির নেতারা অনেক আকর্ষণীয় কথা বলতেন। কাজও করতেন। যেমন চিকিৎসকরা এত বেশি ফিজ নিতেন যে, সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য তাঁদের কাছে যেতে পারত না। অতিলালরা শাসিয়ে দিয়েছিল, দশ টাকার বেশি ফিজ নিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিকিৎসকরা তার বেশি নিচ্ছিলেন না। ফলে তাঁদের কাজ এবং কথা তার মতো অনেককে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। লালপার্টির সঙ্গে তখনো সম্পর্ক ছিল। লালছাত্র সংগঠনের ছেলেরা সেজন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। প্রায় সব ব্যাপার নিয়ে আলোচলা করত। অনুষ্ঠানে ডাকত।

১৯৭২ সালের ভোটের পরে ফ্রেন্ড্স ইউনিয়ন মাঠে লালপার্টির মিটিং হল। মিটঙের জন্য স্কোয়ার ফিল্ড চাওয়া হয়েছিল। জেলাশাসক আগে থেকেই জেলা পুলিশের প্যারেড ঠিক হয়ে আছে বলে দেননি। তার জন্য সভার বক্তারা তাঁকে ও এস. পি-কে শাসকদলের প্রতি পক্ষপাতে অভিযুক্ত করলেন। ক্ষমতায় এলে তাঁদের মতো অফিসারদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তাও বললেন। কামালের মনে হল, প্রশাসকদের কোনও দলের পক্ষে কাজ করা মহা অন্যায়। সে প্রশাসক হলে কোনও বিশেষ দলের হয়ে কাজ করবে না। মিটিং উপলক্ষ্যে আগেই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সভার মত ছিল, 'স্বাধীন দেশের প্রশাসনের

শাসকদলের হয়ে কাজ করা উচিত।' সে বিপক্ষে বলে লালপার্টির বিখ্যাত নেতা ভজহরি কোঙারের হাত থেকে বিপক্ষে প্রথম, এবং পক্ষ-বিপক্ষ মিলিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার নিয়েছিল। সেদিন সভার শুরুতে সুনীল বিশ্বাস বলে পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়সী এক তরুণ নেতা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে বিতর্কে যখন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করছিল যে, স্বাধীন দেশের প্রশাসনের শাসকদলের পক্ষে নয়, নিরপেক্ষভাবে কাজ করা উচিত; তখন স্বতস্ফূর্ত হাততালি পেয়েছিল। তাই তখনই লালপার্টির মিটিঙেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে প্রশাসক হলে সৎ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করবে। তাতেই দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গল। সেই লালপার্টি এখন ক্ষমতায়। সেই পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতার তীব্র সমর্থক নেতারা এখন পুলিশ ও প্রশাসনকে দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে ব্যবহার না করে নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছেন। দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের সর্বোচ্চ পদে বসাচ্ছেন। আর সৎ-অফিসারদের হয়রাণী করছেন, হেনস্থা করছেন। এর বিরোধিতা না করাই দেশের ও দেশবাসীর প্রতি অবিচার করা। সে লিখতে থাকল।

৩

কতকগুলি ঘটনা তাকে তাড়া করে ফিরছিল।

কামাল তখন রাজধানীর পুলিশের ডি. সি হেডকোয়ার্টার্স। কমিশনারের পক্ষে সেই রাজধানীর কোথায় কে মিটিং করতে পারবে তার অনুমতি সে দেয়। সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ব্রিগেড, শহীদমিনার, আর. আর. অ্যাভেনিউ ছাড়া কোথাও অনুমতি দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী সেই মতো বিধানসভায় বিবৃতিও দিয়েছিলেন। এই তিন জায়গার বাইরে সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির নেতারা মিটিং করতে গেল। কামাল অনুমতি দিল না। অনুমতি ছাড়া মিটিং করতে গেলে বিধায়ক সহ সকল অংশগ্রহণকারীকে গ্রেপ্তার করা হল। অতি নীলপার্টি মিটিং করতে গেলেও বিধায়কসহ সবাইকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু যেদিন লালপার্টির মন্ত্রী-সমর্থকরা মিটিং করল, তাদের পুলিশ দিয়ে সাহায্য করা হল। কামাল পক্ষপাতিত্ব করে তাদের অনুমতি দেবে না সেটা জেনেই তারা কামালের কাছ থেকে অনুমতিও চায়নি। সে জানতে পারল যখন দক্ষিণের ডি. সি. ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ চাইল। কামাল তাকে

জানিয়ে দিয়েছিল যে, উল্লেখিত তিন জায়গার বাইরে অনুমতি দেওয়া যাবে না। তখন কমিশনার তাকে কন্ট্রোলরুম থেকে অফিসে ডেকে নিয়ে নিজে পুলিশ দিয়ে দিলেন। বিকেল রাজধানী পুলিশের মুখপাত্র হিসেবে তাকে জিজ্ঞেস করল, "অতি নীলপার্টি বা সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির নেতারা মিটিং করতে গেলে বিধায়কসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে গ্রেপ্তার করেন আর লালপার্টির নেতারা মিটিং করল। আপনারা পুলিশ দিয়ে সাহায্য করলেন। এটা আপনাদের কি ধরনের নিরপেক্ষতা? কামালের কিছুই বলার ছিল না। শুধু ফ্রেণ্ড্স ইউনিয়ন মাঠের লালপার্টির নেতাদের পক্ষপাতহীন প্রশাসনের দাবির কথা মনে পড়েছিল। তার নিরপেক্ষ থাকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়েছিল। মনটা বিদ্রোহ করে উঠছিল।

কামাল তখন গোয়েন্দা বিভাগের তিন নম্বর ডি. সি। গুণ্ডা-দমন শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ফরওয়ার্ডিং মেমো সই করাতে এল। সে পড়ে দেখল, পুলিশ হাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হায়েনাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে। তার কেমন খটকা লাগল। হায়েনা এলাকার কুখ্যাত তোলাবাজ। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর এখানে যে সামান্য দাঙ্গা হয়েছিল তাতে যুক্ত ছিল। তাকে কিছুতেই ধরা যেত না। কামাল অনেক দিন লোক লাগিয়ে তবে ধরেছে। সে কামালের কাছে তার নিজের দাঙ্গায় জড়িত থাকার কথা স্বীকারও করেছে। এক পুলিশ অফিসারের তাকে সহায়তা করার কথাও বলেছে। তার কাছ থেকে এখনো অনেক কিছু বের করার আছে। এমন আসামীকে পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই 'তার হেফাজত আমাদের আর দরকার নেই' লিখে কোর্টে পাঠানো হবে কেন?

ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলল, "স্যার, ওয়ান সাহেব ডেকে তো সে-রকমই বললেন। আপনাকে কিছু বলেননি?"

কামাল ভাবতে লাগল, তাকে কিছু না বলে কেন এ-রকম বলা হয়েছে। আসামী ধরেছে তার লোকেরা। মামলার তদন্তও করছে তার লোক। তাহলে, তাকে কিছু না জানিয়ে আসামীকে বেল পাবার জন্য কোর্টে পাঠানো হচ্ছে কেন? বলল, "না। কি ব্যাপার বলুন তো?"

"স্যার, সাহেবদের ব্যাপার কি করে বলব? তবে হায়েনা তো লালপার্টির আশ্রিত। ফোনটোন এসেছে বোধহয়। আপনি কথা বললেই বুঝতে পারবেন স্যার।"

বোঝার জন্য কামাল ডি. সি. ডি. ডি. ওয়ান-কে ফোনে ধরল।

সে বলল, "কামাল, আমি তো পুরোটা জানি নে। কমিশনার সাহেব .....।" সে বাক্য সম্পূর্ণ করল না। খুব সম্ভবত চালাকি করে। উত্তরটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। কামাল যাতে মনে করে যে, সে যা করেছে তা কমিশনারের নির্দেশ অনুসারেই করেছে। কাজেই সে যা বলেছে তা করে দেবে। আর না করে কমিশনারকে জানালেও খুব অসুবিধা হবে না।

কামাল একটু ভেবে নিল। তারপর কমিশনারের ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

অফিসার জানতে চাইল, "তাহলে হায়েনাকে পাঠানোর কি হবে স্যার?"

"আমি যতক্ষণ না বলছি পাঠানোর দরকার নেই।"

কামাল গিয়ে কমিশনারের ঘরে ঢুকল। অভিবাদন জানিয়ে বলল, "স্যার, হায়েনা কি রকম আসামী তা তো আপনি ভালো করেই জানেন। গুণ্ডা, তোলাবাজ, দাঙ্গাকারী। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এখনো শেষ হয়নি। তাসত্ত্বেও পুলিশ হেফাজত শেষ হওয়ার আগেই আপনি তাকে বেলের বিরোধিতা না করে কোর্টে পাঠাতে বলেছেন কেন? মেয়াদের আগেই ও ছাড়া পেলে তো লোকে বলবে, শাসকদলের লোক বলে জঘন্য অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমরা ধরেছিলাম। আমাদের দুর্নাম হবে।"

কমিশনার রাগ করে উত্তর দিল, "আমি বলব কেন? উত্তমই তো বলল, 'সমিত দেব ফোন করেছিলেন। আমাদের তদন্ত শেষ। বেল হলে কোনও অসুবিধা হবে না।"

"কিন্তু স্যার, তদন্তের তদারকি করছি আমি। এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে ওনার কোনও কথা হয়নি। আর একটু জিজ্ঞেস করলে উনি আপনার নাম করে দিলেন।"

কমিশনার ফোন উঠিয়ে বলল, "উত্তম! তুমি যে বলছিলে, হায়েনাকে ছাড়লে কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু কামাল তো সম্পূর্ণ উলটো কথা বলছে। ....। তোমাকে কে কে ফোন করেছিল? .....। না, না। কামাল যা বলছে, সেটা ঠিক।" ফোন নামিয়ে রেখে বলল, "তুমি যেমন ঠিক মনে কর, কর।"

কামাল অফিসে ফিরে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বলল, "হাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পাঠাবার দরকার নেই।"

অফিসার বলল, "সামনে ভোট স্যার। আজ আপনার জন্য হল না। কিন্তু দেখবেন, ঠিক বের করে নেবে স্যার।"

কামালের খারাপ লাগল এই ভেবে যে, যারা সেদিন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের এত বিরোধিতা করত তারাই এখন ভোটের জন্য দুর্বৃত্ত-নির্ভর হয়ে পড়ছে।

কামাল রাজধানীর পুলিশে সাত বছর ছিল। প্রথম ভোটের ডিউটি কর্পোরেশনের ভোটের। তাকে কুচিপাড়ায় দেওয়া হল। তখন রাজধানীর পুলিশের কমিশনার নীহার তালুকদার। তার মতোই একসময় শাসকদলের সমর্থক থাকলেও সৎলোক। কুচিপাড়ায় আগেরবার ভোটে প্রচণ্ড গন্ডগোল হয়েছিল। টিভি-র লোকেরা গুণ্ডা-বদমাশদের বোমা ফেলার, গুলি ছোড়ার দৃশ্য তুলে দেখিয়েছিল। ভোটের আগে আবার সেগুলি বারবার দেখানো হচ্ছিল। কামাল রাজধানীর পুলিশে আসার আগে বৈকুণ্ঠপুরে ছিল। সৎ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করলে একজন পুলিশ অফিসারকেও মানুষ কত ভালোবাসে তা সে সেখানে বাস্তবে দেখেছিল। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, কাঠচোর, কালোবাজারী, চোরাচালানকারীরা ছাড়া সেখানকার সাধারণ মানুষ তাকে খুবই ভালোবাসত। সেখানে তখন পাহাড়ের তিনটি মহকুমায় টি. এন. এল. এফ-এর আন্দোলন চলছিল। প্রচণ্ড গন্ডগোলের পরিবেশ। তার মধ্যেও নির্বাচনে বড়ো ধরনের কোনও গন্ডগোল হতে দেয়নি; সাধারণ লোকের সমর্থনে। তাই তালুকদার সাহেব তার ওপর কুচিপাড়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কি ভাবে ডিউটি করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটের কদিন আগে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে তার ডাক পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী তখন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও বটে। মুখ্যমন্ত্রী ভিতরে ছিলেন কি না, কামাল জানতে পারেনি। সে গিয়ে দেখল, মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক কথা বলার জন্য ডেকেছেন। তার সঙ্গে রাজধানীর পুলিশ সংগঠনের কয়েকজন নেতাও বসে আছেন। তাঁর কথা কামালের ভালো লাগল না। কামালের প্রতিক্রিয়াও তাঁদের ভালো লাগল না তা বুঝতে পারল। ফিরে এসে কমিশনারকে বলল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার মতো সৎভাবে ডিউটি করবে।" কিন্তু সেদিনই তাকে এমন এক মন্ত্রীর বাড়িতে ডেকে পাঠানো হল যাঁর সঙ্গে কামালের সম্পর্ক খুবই ভালো। সে গেল। কথা বলার পর সম্পর্ক আর আগের মতো অত ভালো থাকল না। সে মন্ত্রীর প্রতি তার এতটাই দুর্বলতা ছিল যে, সেকথা

কমিশনারকেও বলতে পারল না। তবে কাজ সে নিরপেক্ষভাবেই করবে, সে সিদ্ধান্তে অনড় থাকল। তার অধীনে যারা ছিল তাদের সঙ্গে আলোচনা করল। নির্দিষ্ট দিনের আগে এলাকা দেখে নিল। সবাইকে বলে দিল, কেউ গন্ডগোল করতে এলে বরদাস্ত করা হবে না। ভোটের দিনে নির্বিঘ্নে ভোট হল। একটা বোমা পড়ল না। একটা গুলি ছুটল না। কামালের আবারও বিশ্বাস হল, পুলিশ-প্রশাসন সৎ ও নিরপেক্ষভাবে ডিউটি করলে গন্ডগোল ঠেকানো যায়। বিরোধী পক্ষের নেতারা পুলিসের ভূমিকার প্রশংসা করলেন। সরকারি পক্ষের স্থানীয় নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

পরের ভোট বিধানসভার। তার ড্যামহার্স্ট স্ট্রিটে ডিউটি পড়ল। টহল দিচ্ছিল, একটা বুথে আসতে বিরোধী পক্ষের লোকেরা বলল, "স্যার, এই লোকটা এর আগে সাত বার ভোট দিয়ে গেছে। আবার এসেছে। আমরা আপত্তি করছি। কিন্তু পুলিশের লোকরা বলছেন, 'আমাদের কাজ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ক'বার ভোট দিচ্ছে তা দেখা আমাদের কাজ নয়। প্রিজাইডিং অফিসারকে বলুন।' কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসারকে বলার জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে যেতেও দিচ্ছে না।"

কামাল বলল, "কিন্তু ভিতরে প্রিজাইডিং অফিসারকে বলার জন্য তো আপনাদের এজেন্ট আছেন।"

একজন জানাল, "আছে স্যার। কিন্তু মাত্র একজন। কিন্তু ওদের তো অনেক কজন আছে। আমাদের কথা ওরা চিৎকার করে উড়িয়ে দিচ্ছে।"

কামাল জানতে চাইল, "ওদের অনেক কি করে থাকবেন?"

পাশে থেকে আরেকজন বলে উঠল, "কিন্তু দু-তিনজন ডামি প্রার্থীর নামেও ওদের লোক আছে তো স্যার!"

"ডামি প্রার্থী মানে?"

প্রথমজন জানাল, "স্যার বুথের ভিতর নিজেদের বেশি লোক রাখার জন্য ওরা আসল প্রার্থী ছাড়াও আরও দুজন প্রার্থী দিয়ে রেখেছে। তাদের এজেন্টরাও কাজ করছে।"

কামালের মনে হল, অভিযোগ সত্যি হলে, ভোটে জেতার জন্য এই কৌশলকে ন্যায্য না বলা যেতে পারে; কিন্তু বেআইনী বলা যাবে না। কামাল ভাবছিল।

দ্বিতীয়জন বলল, "স্যার ওর আঙুল পরীক্ষা করে দেখুন, কালি লাগানো আছে।"

কামাল দেখল, লোকটি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত পরীক্ষা করে দেখল, সত্যি তার হাতের আঙুলে ভোট দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ কালি লাগানো আছে। মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মোছেনি। কামাল তাকে লাইন থেকে বের করে নিল। পাশে এনে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভোট দেওয়ার পর আবার কেন ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন?"

লোকটি কোনও কথা বলল না।

কামাল জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কি?"

"কমল পাল স্যার?"

"ঠিকানা কি?"

"৩/৪ হ্যাঙ্গি লেন স্যার।"

সঙ্গে উপস্থিত লোকেরা আপত্তি করে বলল, "মিথ্যা বলছে স্যার। আমরা ওই বস্তিতে থাকি। ও ওখানে থাকে না স্যার।"

ততক্ষণে অন্যপক্ষের সমর্থকরাও চলে এসেছে। তারা তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলল, "আপনি ভোটের লাইন থেকে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন না স্যার।"

কামাল খানিকক্ষণ শুনল। তারপর বিনয়ের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে বলল, "আপনাদের আইন অনুসারে একজন ভোটারের ক'বার ভোট দেবার কথা?"

তারা সমস্বরে বলে উঠল, "কেন স্যার?"

কামাল বলল, "হাতের আঙুল পরীক্ষা করে দেখুন, উনি আজ ভোট দিয়েছেন কি না। তারপর কথা বলুন।"

তেড়ে আসা লোকগুলি এর-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সরে পড়ল।

কামাল প্রিজাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলে কমল পালকে থানায় পাঠিয়ে দিল।

উত্তরের দিকে ড্যামহার্স্ট থানার কাছে আসতেই যে বাড়িটায় ভোটের বুথ হয়েছিল সেখান থেকে কয়েকজন লোক ছুটে এসে বলল, "স্যার, আমাদের ভোটারদের লালপার্টির গুণ্ডারা মেরে ভাগিয়ে দিচ্ছে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করুন।"

কামাল জানতে চাইল, "আপনাদের ভোটার মানে?"

"যারা আমাদেরকে ভোট দেবে বলে ওরা মনে করছে।"

"কারা মেরে ভাগিয়ে দিচ্ছে।"

কতকগুলো ছেলের দিকে ইশারা করে বলল, "ওই গুণ্ডারা স্যার।"

"গুণ্ডা বলছেন কেন? ওদের কাছে তো লাঠিসোটা কিছু নেই।"

"লাঠিসোটা কি হবে স্যার। কাধে ব্যাগ দেখছেন না! ব্যাগের মধ্যে বোমা আর মেশিন আছে। ভোটারদের বের করে দেখিয়ে চমকাচ্ছে।"

কামাল তার লোকজন নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটি ছেলে পালিয়ে গেল। জনাদুয়েক গিয়ে লালপার্টির ক্যাম্প-কাউন্টারে এসে বসে পড়ল।

কামাল এগিয়ে গিয়ে বলল, "এখানে তো একটি টেবিল আর দুটো চেয়ারের বেশি থাকার কথা নয়। এতগুলো চেয়ার পেতেছেন কেন? তুলে ফেলুন। আর দুজনের বেশি যাঁরা আছেন তাঁরা সরে যান।"

এসে বসা ছেলে দুটো উঠে দাঁড়াল।

তাদের ব্যাগ দেখে কামালের সন্দেহ হল। সে লম্বাটে ছেলেটার হাত দুটো ধরল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছেলেটা ছুটতে শুরু করল। কামালের সঙ্গের লোকেরা তাড়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না। ফিরে এসে ব্যাগ সার্চ করতে একটা গুলিভর্তি পাইপগান ও আরও তিনটে গুলি পাওয়া গেল। কামাল সেগুলো সিজ করে থানার মামলা শুরু করল। ভোট ভালোভাবে হল। কিন্তু তার সম্বন্ধে শাসকদলের ধারণা ভালো হল না।

এরফলে তাকে আর ভোটে ডিউটিই দেওয়া হয় না। গত ভোটের আগের ভোটে সে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেই পারল না। তাকে ভোটে ডিউটি দেওয়া হল না। ফলে ডিউটি সার্টিফিকেট পেল না। ভোট দেওয়ার জন্য ছুটি চাইল। তাকে ছুটি না দিয়ে অফিসে উপস্থিত থাকতে বলল। কন্ট্রোলরুমেও ডিউটি দিল না। সেখানেও তাকে রাখা স্বস্তিকর নয়। কারণ কে ফোন করলে কি রকম তাড়াতাড়ি কত ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিতে হবে, সে-ব্যাপারে তার সম্যক ধারণা নেই। সে মুড়ি-মুড়কি, সব এক দর দেয়। কাজেই তাকে না রাখাই স্বস্তিকর।

গত পার্লামেন্টারী ভোটের মাসখানেক আগে সে দরখাস্ত দিয়ে রাখল, হয় তাকে ভোটে ডিউটি দেওয়া হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হোক, যার বলে সে ডাকযোগে ভোট দিতে পারবে; না হলে তাকে ভোটের সময় ছুটি দেওয়া হোক। তার বিভাগ তাকে তিন দিনের ছুটিই দিয়ে দিল। যখন

ভোটে ডিউটির জন্য বাইরে থেকে রাজ্য সরকারের বাড়তি পয়সা খরচ করে লোক আনতে হচ্ছে, নতুন লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে তখন তাকে সরকার ভোটের কাজে না লাগিয়ে ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। এতদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় সে এটা পরিস্কার বুঝতে পারে যে, শাসকদলের অন্তত সম্মতি ছাড়া এটা হচ্ছে না। অর্থাৎ যে-দল সে একদিন করত, যে-দল তার বাড়ির লোকজন এখনো করে, সে-দল ভোটের কাজে তাকে চায় না। তার অপরাধ একটাই, সে ভোটে কারচুপি করতে সাহায্য করে না। এটা সেই দল, যারা যখন বিরোধী ছিল তখন প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করত। এখন সে পক্ষপাতিত্ব না করার জন্য তার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছে। তাকে ভোটের ডিউটি থেকে দূরে রাখছে।

নিজে ভোটের ডিউটি না করলেও অন্যদের কাছ থেকে ভুয়ো ভোট, বুথ দখল, ভোটে কারচুপির কথা তার গোচরে এসেই যাচ্ছে।

এর আগের বার বিধানসভা ভোটের পরের দিন তার স্টেনো সঞ্জিত এসে বলল, "স্যার, আর কি বলব। আমি ওদেরই সমর্থক। ওদেরকেই ভোট দিই। কিন্তু দেব কি না, সে-বিশ্বাস রাখতে পারছে না। নিজেরাই দিয়ে নিচ্ছে।"

"নিজেরা দিয়ে নিচ্ছে মানে?" কামাল বোঝার চেষ্টা করল, "কি করে দিয়ে নিচ্ছে।?"

সঞ্জিত বলল, "স্যার, বারোটা নাগাদ ভোট দিতে গেলাম। লাইনে দাঁড়াতে গেছি। তমালদা এসে বলল, "আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আপনি বাড়ি চলে যান।"

"আপনি কি করলেন?"

"কি করব স্যার? বাড়ি চলে এলাম।"

"আপনি তো টেণ্ডার ভোট দিতে পারতেন।"

"দেব বলছিলাম স্যার। কিন্তু উনি বললেন, 'টেণ্ডার ভোট মানে তো কেউ জাল ভোট দিয়েছে তা প্রমাণ হয়ে গেল। শুনেছি দশের বেশি টেণ্ডার ভোট হলে নাকি রি-পোলের অর্ডার দেয়। আপনার ভোট দেওয়ার আর দরকার নেই।' বাড়ি চলে যান।"

"আপনি বাড়ি চলে এলেন?"

"কি করব স্যার? ওদের সঙ্গে ঝামেলা করে ওখানে থাকতে পারব?

মেয়েটা একা একা স্কুলে যায়। কবে হয় তো গুণ্ডা লাগিয়ে মেয়েটাকেই কিডন্যাপ করিয়ে দেবে।"

"পুলিশে খবর দেবেন!"

"পুলিশ তো ওদের কথায় চলে স্যার। ওরা বললে কেস করবে। না বললে করবে না।"

কামাল এ-অভিযোগ অস্বীকার করতে পারল না।

গত সপ্তাহেই তার সোসাইটির অফিস সেক্রেটারি হারুনের কাছে সে এ-রকম একটি ঘটনার কথা শুনেছে। হারুনের নিজের মামাদের মধ্যে জমির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধ। এক মামা অন্য মামার জমি দখল করে নিচ্ছে। যার জমি সে বাধা দিতে গেলে, মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আহত মামা ডাক্তার দেখিয়ে থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছে। অপরাধী মামার সাথে এলাকার শাসকদলের নেতার খাতির আছে। থানার ওসি অভিযোগকারী মামার উপস্থিতিতেই সেই নেতাকে ফোন করে কি কর্তব্য জিজ্ঞেস করেছে এবং কোনও অভিযোগ না নিয়ে তার আহত মামাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কামাল সে জেলার এস. পি-কে বলার পরেই থানা কেস শুরু করেছে।

তার প্রকাশক সিদ্ধার্থ বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা প্রায় অনুরূপ। সে কামালকে বলেছে, "আর বলবেন না? আমি ভোট দিতে গিয়েছি। গোপনে ভোট দেব। শাসকদলের পোলিং এজেন্ট এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আমি কাকে ভোট দেব দেখতে পাবে। প্রিসাইডং অফিসার কিছু বলছে না। অন্য এজেন্টও না। আমি বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়ে বেরিয়ে এলাম।" শুনে কামালের প্রচণ্ড খারাপ লাগল। দেশের আইনে গোপন ভোটের ব্যবস্থা আছে। শাসকদলের লোকেরা তার ওপরও থাবা বসাচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

গত পার্লামেন্টারী ভোটের সময় তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল। তার অফিস-অর্ডালি তাপসের পশ্চিম জেলায় ডিউটি পড়েছিল। ডিউটি থেকে ফিরে এসে বলল, "স্যার আর কি বলব? আগের দিন আমাদের নিয়ে গেল। আমাদের দলের দায়িত্বে লোকাল থানার একজন এস. আই. ছিল। আর প্রিসাইডিং অফিসার ছিল স্থানীয় স্কুলের এক মাস্টারমশাই। আমার যাওয়ার পরপরই তিনজন লোক এল। তারা ওই এস. আই. আর প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কি সব আলোচনা করল। তারপর দেখলাম খাবার-দাবার সব চলে এল।"

"আপনারা তাদের দেওয়া খাবার খেলেন?"

"কি করব স্যার। আমি খাব না, বলছিলাম। কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টারবাবু নিজেও খেলেন, আমাদেরকেও দিলেন। আমরা তো বেডিং নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা বিছানাপত্রও পাঠিয়ে দিল।"

"তারপর কি হল?"

"স্যার, সকলে আরাম করে ঘুমোল। পরের দিন ভোট আরম্ভ হতে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই তিনজন লোক এসে বোতাম টিপে টিপে বিকেলের আগেই ভোট শেষ করে দিল। বেলাবেলি আমরা ভোটের মেশিন নিয়ে ফিরে এলাম।"

"শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ স্যার। কোনওরকম গন্ডগোল বা অশান্তি নেই।"

"বিরোধীদলের পোলিং এজেন্ট ছিল না?"

"প্রথম দিকে ছিল স্যার। কিন্তু ওরা দলবল নিয়ে আসতে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে আসেনি।"

"ওদের যাতে পালিয়ে না যেতে হয় তার জন্যই তো আপনাদের ওখানে পাঠানো।"

"আমি কি করব স্যার। আমি তো কন্‌স্টোবোল। সাব-ইন্সপেক্টারবাবু কিছু করতে বললেন না।"

কামালের খারাপ লাগল। তাদের গণতন্ত্র কোনও পথে যাচ্ছে? খবরের কাগজের একটা রিপোর্টের কথা মনে পড়ে গেল। খুঁজে রিপোর্টটা বের করল। ওখানে শাসকদলের প্রার্থী কয়েক লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতেছে। কয়েকটি বুথে ১০০ শতাংশ ভোট পড়েছে। একশো শতাংশই শাসকদলের প্রার্থীর পক্ষে। এ-রকম ভোট পড়া কি সৎ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ইঙ্গিত বহন করে? কোনও বুথের সব ভোটদাতারাই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতে পারে। তাহলেও একশো শতাংশ ভোট পড়ার সম্ভাবনা কম। ভোটার তালিকা তৈরি করার পর দুয়েকজন ভোটার মারা যেতেই পারে। দুয়েকজন ভোটার কর্ম উপলক্ষে বাইরে থাকতে পারে। দুয়েকজন গুরুতর অসুস্থ থাকতে পারে। দুয়েকজন জরুরী কাজে (আত্মীয়স্বজনের অসুস্থতা বা বাইরে থেকে কোনও খবর আসার জন্য) অন্যত্র রওনা হতে পারে। দুয়েকজন কাউকেই ভোট না দিতে চাইতে পারে। কাজেই এ-রকম

প্রায় সব ভোট পড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার, যা আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

পরের বার বাড়ি ফিরে সে তার বাল্যবন্ধু নাজিমের সঙ্গে আলোচনা করছিল। নাজিম প্রথম থেকে লালপার্টির কর্মী। এদিকে কয়েক বছর আর মেম্বারশিপ রিনিউ করেনি। তবে এখনো লালপার্টিরই সমর্থক।

সবিস্তারে সব বর্ণনা করার পর কামাল বলেছিল, "নাজিম বল্, ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে? যারা যাকে ভোট দিতে চাচ্ছে তাকে ভোট দিতে না পারলে গণতন্ত্র থাকে কি করে?"

নাজিম বলেছিল, "আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু করতে পারিনে। এই তো আমার রাজাপুরে ডিউটি পড়েছিল। প্রথম ঘণ্টা দুয়েক ঠিকভাবে ভোট হল। তারপর বাইরে একটা বোম পড়ল। দুদ্দাড় করে সব পালাতে লাগল। ট্রেনিং বিহীন, লালব্যাণ্ড লাগানো দুজন হোমগার্ড ছিল। তারাই ভয়ে কাঁপতে লাগল। নীলপার্টির পোলিং এজেন্ট 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে এল না। এক তরফা ভোট হয়ে গেল। আমি পার্টি অফিসে পরে বললাম, 'এটা ঠিক হচ্ছে না।' কানই করল না।"

নাজিমের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার মিল আছে। সে-ও তার ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি এ-ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। একটা দল একটানা অনেক দিন ক্ষমতায় থাকার এবং পরের নির্বাচনেও থেকে যাবার সম্ভাবনার ফলে গণতন্ত্রের অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। যে আমলাদের শাসকদল পছন্দ করে তাদের অপরাধের কোনও সাজা হয় না। হবার ভয়ও নেই। বরং অপরাধের জন্য তারা ভালো ভালো পোস্টিং পায়। ফলে নিয়ম-কানুনের কোনও তোয়াক্কা করে না। যদি বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা থাকত এদের ভয় থাকত। এরা বেআইনী কাজ করে শাসকদলের নেতাদের সন্তুষ্ট করতে ভয় পেত। সরকার বদল হলে অপরাধ করা আমলাদের সাজা হত। যেমন পাঞ্জাবে হয়েছে। বিহারে হয়েছে। আইন মেনে কাজ করত। গণতন্ত্র মজবুত হত।

কামাল নাজিমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটছিল। কদমগাছার শমসের এসে সামনে দাঁড়াল, "আপনি তো পুলিশের বড়ো অফিসার। আপনি এর বিচার করে দেন?"

কামাল দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, "কিসের বিচার?"

শমসের বলল, "আপনি তো জানেন, আমি গরুর দলাল। এক জায়গার গরু কিনে অন্য জায়গায় বেঁচে খাই।"

"তো?"

"আপনাদের গিরামের লায়েকের ব্যাটা বুলছে, থানা উয়াকে আদায় করতে লাগিয়েছে। প্রত্যেক গরুর জন্যে একশো টাকা করে দিতে হবে।"

কামাল বিব্রতবোধ করল। সে বুঝতে পারল, শমসের কি বলতে চাইছে। লায়েক গ্রামের লালপার্টির নেতা। থানা তার ছেলেকে থানার হয়ে, যারা গরু পাচার করে তাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করার জন্য নিযুক্ত করেছে। সে টাকা আদায় করে থানার নির্দিষ্ট ডাকমাস্টারের কাছে জমা করছে। জমা করা টাকা থেকে একটা অংশ পাচ্ছে। এর আগের বার যখন বাড়িতে এসেছিল তখন এই টাকা আদায় নিয়ে কথা কাটাকাটি এবং অবশেষে মারামারি তার সামনে পড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা জানার পর সে গ্রামের আরেক লালপার্টির নেতা সানারুলকে ডেকে সব কথা বলে, এটা বন্ধ করার জন্য লায়েককে বলতে বলেছিল।

পরের দিন সানারুল এসে বলেছিল, "আমি বলেছিলাম। তো লায়েকের স্ত্রী বলল, 'থানার টাকা আদায় করবে না তো খাবে কি? তাহলে কামালমামাকে বলো গা, একটা চাকরি করে দিবে।' এ-কথার কি উত্তর দিব বলেন দেখি?"

কামাল ভাবছিল, সমস্যা কত গভীর। গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনতা নেই। বুনিয়াদী চরিত্রও তত শক্ত নয়। প্রশাসনের লোকেরা তার পুরো সুযোগ নিচ্ছে। যে লালপার্টির নেতারা একদিন স্বচ্ছ, সৎ প্রশাসনের কথা বলত, তাদের দিয়ে এখন পুলিশ ঘুষ আদায় করছে। তাদের সঙ্গে ভাগ কবে নিচ্ছে। বুনিয়াদী সততা কোথায় গিয়েছে। এখানকার রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, প্রশাসনের সকলেই জানেন, গরু পাচার হয়। দুটো দেশের মধ্যে কোনও বস্তুর দামের এবং চাহিদার যখন এত ব্যবধান থাকে তখন হওয়াটা-ই স্বাভাবিক। ভারতের হিন্দুরা গরুকে শ্রদ্ধা করে। গরু কাটে না। গরুর মাংস খায় না। রপ্তানীও করে না। অনেক রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধও। কিন্তু পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে গোহত্যা নিষিদ্ধ নয়। সেখানকার মুসলমানদের অনেকেই গোমাংস খায়। কেউ কেউ বিদেশে রপ্তানী করে। ফলে সেখানে গরুর চাহিদা অনেক বেশি। দামও এখানকার তুলনায় বেশি। ফলে এ-দেশ থেকে গরু

ও-দেশে পাচার হয়। সব থেকে ভালো হয়, যদি সরকার কর নিয়ে রপ্তানী করার অনুমতি দিয়ে দেয়। তা না হলে পুলিশ ও অন্যান্য প্রশাসনের লোকদের উচিত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া। গরু বড়ো ধরনের জীবন্ত প্রাণী। খুব সহজে লুকিয়ে রাখা যায় না। প্রসাসন ইচ্ছে করলে গরু পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে। আর তারা যদি মনে করে যে, সরকার অনুমতি না দিলেও পাচার করতে দেওয়া উচিত, তাহলে ঘুষ না নিয়ে পাচার করতে দিক। তা না করে, ঘুষ আদায় করে পাচার করতে দেওয়া এবং যে ঘুষ দেবে না তার গরু আটক করে কেস করার নীতি নিয়ে প্রশাসনের লোকেরা এলাকার একটা বিরাট সংখ্যক লোককে অপরাধী তৈরি করছে। রাজনৈতিক নেতাদেরও অসৎ করে দিচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। তার জন্যই কামাল বলেছিল। কিন্তু তা করতে হলে বিকল্প কাজের আরও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হওয়ার জন্য কিছু কাজের সৃষ্টি হয়েছে। সে এবার একটা বি. এড কলেজ করার প্রস্তাব পাঠাবে। একটা বিস্কুটের কারখানা করা যায় কি না, সে-চিন্তাও করবে।

কিন্তু তার আগেই আবার এই শমসের। শমসের বলল, "আমি গরু কিনছি দেশের মধ্যে থেকে। বেঁচছিও দেশের মধ্যেই। এই হাটখেলার হাটেই। তাহলে আমি ঘুষ দেব ক্যানে?"

কামাল শমসেরের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারল না। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলল, "কিন্তু আমার তো এখানে পোস্টিং না। আপনাকে বিচার চাইতে হলে এখানে যারা আছে তাদের কাছে যেতে হবে।"

শমসের আপত্তি করল, "যারা টাকা আদায় করতে লাগিয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে কি হবে? তারা কোনও ব্যবস্থা লিবে?"

কামাল এড়িয়ে যাবার জন্য বলল, "তারা লাগিয়েছে সেটা ভাবছেন কেন?"

"থানা না লাগালে লায়েকের ব্যাটার বাপের ক্ষ্যামতা আছে মারধোর করে টাকা আদায় করে? আমরা মেরে ওর ঠ্যাং খোড়া করে দিতাম না? কিন্তু ওকে কিছু বললেই পুলিশ আমাদের তুলে মিথ্যা কেস দিবে। আর যদি না-ই লাগাবে তাহলে প্রকাশ্যে টাকা আদায় করার জন্য ওদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা লিছে না ক্যানে?"

"কিন্তু আমি তো অন্য জায়গায় পোস্টিং ...।"

"কিন্তু, জামাল তো বুলছিল, আপনি রাজ্যের যে কোনও জায়গার পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেস করতে পারেন।"

কামাল এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারল না। প্রচণ্ড বিব্রতবোধ করল। তার মনে হল, নিজে সৎ থাকার পরও, অসৎ পুলিশ অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতাদের জন্য তার একদিন বাড়িতে এসেও শান্তি নেই। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

কামাল লিখতে থাকল।

৪

লিখতে লিখতে বেশ বড়ো হয়ে গেল। পত্রিকায় অংশবিশেষ ছাপতে গেল। সবটা নিয়ে একটা বই ছাপতে গেল। প্রবন্ধ বের হতেই হইচই শুরু হয়ে গেল।

অফিস-অর্ডালি গিরীন সাম্প্রতিকী এবং ভারত টাইম্‌সের কপি এনে তার সামনে রাখল, "আপনার প্রবন্ধের ব্যাপারে কি লিখেছে, দেখেছেন স্যার?"

কামাল তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। কোনও প্রতিবেদকেই তার লেখাটা ঠিক মতো পড়েছে বলে মনে হল না। সে পুলিশকে সৎ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ করতে হলে কি করতে হবে তা বিশ্লেষণ করে লিখেছে। সে-কথায় না গিয়ে তারা শুধু দুয়েকটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছে। তার থেকে কারও মনে হতে পারে যে, সে শুধু মন্ত্রী ও আমলাদের সরকারি গাড়ির অপব্যবহার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লিখেছে। সে কাগজ রেখে অফিসের কাজ করতে লাগল।

বাড়ি ফিরে সবে পোশাক ছেড়েছে। অমনি ডক্টর বোসের ফোন এল, "তারানন্দ চ্যানেলটা একবার খুলুন। আপনি কোথায় কি লিখেছেন তা নিয়ে আলোচনা দিচ্ছে।"

কামাল টিভি অন করে তারানন্দ চ্যানেলে দিল। দেখল, মনসুর রহমানের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। হেড লাইন, পাঁচপাঁচটা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেন, তা অস্বীকার করছেন না মন্ত্রী মনসুর রহমান।

তিনি বলছেন, "যখন মকসুদাবাদে যাই একটা গাড়ি নিয়ে যাই। গিয়ে ডি. এম পুল থেকে একটা গাড়ি নিই। আবার ফেরার সময় একটা গাড়ি

নিই। সেটা ডেয়ারী পুলের, পোল্‌ট্রি পুলের বা ফেডারেশানের।"

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি মকসুদাবাদে কিসের জন্য যান? তিনি রাজ্যের মন্ত্রী। রাজ্যে কয়েক হাজার গ্রাম আছে। প্রতি গ্রাম তাঁর কাজের মধ্যে। কাজেই সরকারি কাজে একটি গ্রামে বছরে একবারের বেশি যাবার কথা নয়। যদি ব্লকের কথা ধরা যায়। রাজ্যে তিনশোরও বেশি ব্লক আছে। সরকারি কাজে কোনও ব্লকে বছরে একবারের বেশি যাবার কথা নয়। যদি জেলার কথাও ধরা যায়। রাজ্যে ১৯ টা জেলা আছে। সরকারি কাজের জন্য কোনও জেলায় বছরে দু-তিন বারের বেশি যাবার কথা নয়। তাহলে বছরে পঞ্চাশ-ষাটবার মকসুদাবাদে যাওয়া সরকারি কাজে হতে পারে না। তিনি যান, হয়, নিজের কাজে; না হয়,পার্টির কাজে। নিজের কাজে বা পার্টির কাজে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা যায় না। বিনা খরচে সরকারি সার্কিট হাউসে থাকা যায় না। কারণ সরকারি টাকা মন্ত্রীদের নিজেদের টাকা নয়। সরকারি টাকা আসে সাধারণ লোকের কর থেকে। সে-টাকায়, একটা গাড়ি কমলে স্কুলে একজন শিক্ষক বাড়ানো যায়। সেকশানে ১৪০ জন ছাত্রের পরিবর্তে ৪০ জন ছাত্র হতে পারে। একটা গাড়ি কমলে গ্রামে এক কিলো মিটার রাস্তা হয়। মুমূর্ষ রোগী হাসপাতালে পৌঁছুতে পারে। একটা গাড়ি কমলে হাসপাতালে কিছু জীবনদায়ী ওষুধ আসে। গরিব মানুষরা পায়। একটা গাড়ি কমলে স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা মিড-ডে মিল পায়। কিন্তু মন্ত্রী মশায়ের সে-সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। কামালের পদও সারা রাজ্যের। সে তো প্রতি সপ্তাহে কেন? কোনও সপ্তাহেই সরকারি গাড়ি নিয়ে দেশের বাড়ি যায় না। কারণ দেশের বাড়িতে সরকারি কাজ থাকে না। মন্ত্রীর দেশের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে সরকারি কাজ থাকে কি করে?

সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "আপনি যে পাঁচ-পাঁচটা গাড়ি ব্যবহার করেন, নিজের কাজে ব্যবহার করেন, পার্টির কাজে ব্যবহার করেন, এগুলি কি অন্যায় নয়?"

মনসুর রহমান উত্তর দিলেন, "অন্যায় তো অন্যায়। বিগ্রেডে মিটিং হলে তিরিশটা সরকারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে।" অর্থাৎ আর সব মন্ত্রীও করে। আমিও করি।

কামালের মনে প্রশ্ন জাগল, যে-পার্টি সৎ প্রশাসন চায় সে-পার্টির কোনও নেতা-মন্ত্রী কি এ-রকম কথা বলতে পারেন? মন্ত্রী নিজেই যদি এ-রকম কথা

বলেন, তাহলে তো তার অধীনে যারা কাজ করে তারা দুর্নীতিতে আরও উৎসাহ পাবে। কামাল তো তার প্রবন্ধে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। তার থেকেও বড়ো কথা কোনও মন্ত্রী কি এ-রকম কথা বুক ফুলিয়ে বলে ক্ষমতায় থাকতে পারেন? কামাল মন্ত্রীদের আচরণবিধি দেখতে লাগল।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বহুল পরিমাণে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি থেকে নেওয়া। সেই ব্রিটেনের মন্ত্রীদের আচরণ বিধির ৪.১ পরিচ্ছেদে পরিস্কার বলা আছে, "মন্ত্রীদের অফিসের কাজের জন্য সরকারি খরচে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা তাঁদের পার্টি বা নির্বাচন কেন্দ্রের কাজে ব্যবহার করা নীতিগতভাবে অন্যায়। ....। সাধারণ সাংসদদের মতো মন্ত্রীদেরও তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রের কাজ নিজের খরচে করা উচিত।" ৪.২ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সাধারণভাবে নির্বাচন কেন্দ্রের কাজে বা পার্টির স্বার্থে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করা যাবে না।"

ভারতের নির্বাচন কমিশন যে-মডেল আচরণ বিধি ঘোষণা করেছে, তাতেও পরিস্কার বলা আছে, "মন্ত্রীরা অফিসের কাজের জন্য ভ্রমণের সঙ্গে ভোটের কাজ জুড়বেন না এবং ভোটের কাজে অফিসের ক্ষমতা ও লোকজনকে ব্যবহার করবেন না। ক্ষমতাসীন পার্টির স্বার্থসিদ্ধির জন্য উড়োজাহাজ, গাড়ি, প্রভাব সমেত অফিসের পরিবহন ও লোকজনকে ব্যবহার করা যাবে না।"

নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি স্বাভাবিকভাবেই ভোট ঘোষণার সময় থেকে ভোটের ফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যা ন্যায়সঙ্গত, নির্বাচন কমিশন তাই করার জন্য ঘোষণা করে। কাজেই অন্য সময়ও মন্ত্রীদের এগুলো নির্বাচন কমিশনের নির্দেশরূপে না হলেও, ন্যায়নীতি হিসেবে মেনে চলার কথা। ব্রিটেনের মন্ত্রীদের আচরণ বিধিতে সে-কথা খুব পরিস্কারভাবে বলাও হয়েছে।

কাজেই পাঁচ-পাঁচটি তো দূরের কথা, সরকারি কাজ ছাড়া মন্ত্রী একটা সরকারি গাড়িও ব্যবহার করতে পারেন না। রাজ্যে হাজার গ্রাম আছে। তিনশোরও বেশি ব্লক আছে। কাজেই ব্লক হিসেবে ধরলেও বছরে নিজের ব্লকে মন্ত্রীর এক দিনের বেশি সরকারি কাজ থাকতে পারে না। তাহলে একজন মন্ত্রী বছরে পঞ্চাশ-ষাটবার সরকারি গাড়িতে নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে আসেন কি করে? একটি ব্লকে অতদিন সরকারি কাজ থাকতে পারে না।

পার্টির কাজ বা নিজের কাজ থাকতে পারে। কাজেই বছরে উনপঞ্চাশবারই তিনি নিজের বা দলের কাজে সরকারি গাড়ি নিয়ে আসেন। এটা চলতে পারে না। কারণ, গাড়ির দাম, ড্রাইভারের বেতন, তেলের দাম-সবই সরকারি কোষাগার থেকে মেটাতে হয়। সরকারি টাকা আসে লোকের কাছ থেকে। কামালের আবারও মনে হল, মন্ত্রীরা এ-রকম পাঁচ-পাঁচটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে সরকারি অর্থের শ্রাদ্ধ না করলে সেই টাকায় স্কুলে একজন শিক্ষক হতে পারে, গ্রামে এক কিলোমিটার রাস্তা হতে পারে, হাসপাতালে কয়েকটা জীবনদায়ী ওষুধ আসতে পারে। যারা স্কুলে-কলেজে শিক্ষকের পদ খালি রেখে, গ্রামে রাস্তা করা বন্ধ রেখে, হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ কেনা বন্ধ রেখে পাঁচ-পাঁচটা গাড়ি চড়ে সাধারণ মানুষের পয়সা ওড়ায় তাঁদের জনগণের ভোট দেওয়া উচিত নয়। কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন,

"যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা থাকে আমার রক্তলেখায় তাঁদের সর্বনাশ।"

বিদ্রোহী কবি আজ নেই। কিন্তু কামালরা তার উত্তরসূরীরা আছে। তারা কেন লিখবে না তাঁদের সর্বনাশ, যারা স্কুলে-কলেজে শিক্ষকের পদ খালি রেখে, গ্রামে রাস্তা করা বন্ধ রেখে, হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ কেনা বন্ধ রেখে পাঁচ-পাঁচটা গাড়ি চড়ে সাধরণ মানুষের পয়সা ওড়ায়?

মন্ত্রীদের বেপরোয়া অন্যায় খরচের বিরুদ্ধে তার মতো সাধারণ মানুষের বলার অধিকার আছে। কারণ মন্ত্রীরা যে-টাকা খরচ করে সে-টাকা তাদের সকলের। মন্ত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। তাই মন্ত্রী বলতে পারেন না, "অন্যায় তো অন্যায়।" যেদিন দেশের লোকেরা গাড়ি আটকে জিজ্ঞেস করবে, "সরকারি গাড়ি চড়ে কোনও সরকারি কাজে এসেছেন মশাই? তার কৈফিয়ৎ চাই!" তখন কি তিনি বলতে পারবেন, "অন্যায় তো অন্যায়।"

ফোনটা বেজে উঠল। ধরতে ওপার থেকে দক্ষিণের লালপার্টির নেতা প্রণব সেন বললেন, "আমাদের পার্টির যা নিয়ম তাতে প্রকাশ্যে তো আপনাকে সমর্থন করতে পারব না। তবে আপনি পার্টির উপকার করেছেন। এরা পার্টিটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কোরাপশানে ভরিয়ে দিচ্ছে। আপনার লেখার ফলে হইচই হওয়াতে যদি সামান্যতমও চেঞ্জ হয়!"

কামালের মনে হল, ভালোভাবে নিলে হত। যারা অন্যায় করছে তাদের নিরুৎসাহিত করলে হতে পারত। কিন্তু পার্টির নেতারা তো তাদের আড়াল

করছে। কি করে পরিবর্তন হবে?

কামালের ইচ্ছে হল, আর কে কি বলছে দেখে। ততক্ষণে লালপার্টির রাজ্য সম্পাদক সুনীল বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। তিনি কামালের প্রতি যতটা বিষ উগরে দেওয়া সম্ভব দিচ্ছেন, "সরকারি গাড়ির অপব্যবহার কাকে বলে? সরকারি গাড়ি করে যদি স্ত্রীকে অফিসে পৌঁছে দেয়, খুব কি অন্যায়? যে বলে তার রুচিবোধ নেই। যদি মেয়েকে স্কুলে ড্রপ দিয়ে দেয়, অন্যায়? যে বলে তার মানবিক রুচিবোধ নেই। আমি তার উপন্যাস-টুপন্যাসও পড়েছি। রুচিবোধের কোনও পরিচয় পাইনি।"

কামালের বুকের ভিতরটা জ্বালা করছিল। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, "ডাকাতি-মার্ডার কেস দেখতে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাওয়া যায় না। অথচ আমলা-মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেবার জন্য, স্ত্রীর প্রমোদ ভ্রমণের জন্য, এমনকি বাড়ির লোকজনের ঘোরার জন্য সরকারি পয়সায় আলাদা আলাদা গাড়ি ভাড়া করা থাকে। সেটা অন্যায় কি না? পুলিশের নামে গাড়ি ভাড়া করে অন্য বিভাগের অফিসারদের এবং পার্টির নেতাদের দিয়ে রাখা হয়। সেটা অন্যায় কি না? কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে? করে কি লাভ? সে তো প্রবন্ধে এ-সব কথা লেখেওনি।

পুলিশের ভাবমূর্তি কি করে উজ্জ্বল করা যাবে তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে বলেছে, পুলিশকে সৎ করতে হলে তারা যাঁদের অধীনে কাজ করে, তাঁদের আচরণ স্বচ্ছ ও সৎ হতে হবে। তাঁরা অসৎ হলে পুলিশকে সৎ হতে বলতে পারবেন না। তাঁদের অসততা নিয়ে গণমাধ্যমে যে-সব খবর বের হয় তার দুয়েকটি উদাহরণ দিয়েছে। এ-রকম যাতে না হয় তার উপায় নির্দেশ করেছে। কিন্তু শাসকদলের নেতারা সরকারি খরচের গাড়ি বা টেলিফোনের ব্যবহারের আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ফলে জনগণ কাঠফাটা রোদ্রে পুড়তে থাকলেও জনগণের নেতারা জনগণের চাঁদায় অফিসের বাড়িতে, গাড়িতে, এমনকি পার্টিঅফিসে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র লাগাচ্ছে। আর তাই সরকারি গাড়ির অপব্যবহারের প্রশ্ন ওঠায় যারপরনাই চটে যাচ্ছেন। সাধারণ লোকের সহানুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখানোর জন্য স্ত্রীকে অফিসে পৌঁছে দেবার বা মেয়েকে স্কুলে ড্রপ দিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন, যদিও তার প্রবন্ধে স্ত্রীকে অফিসে বা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেবার কোনও প্রসঙ্গই নেই।

কামাল ভাবতেই পারে না, ২৩ বছর আগের ফ্রেণ্ড্স ইউনিয়ন মাঠে বিরোধীদলের নেতা হিসেবে বক্তৃতা দেওয়া সেই সুনীল বিশ্বাসই আজকের শাসকদলের রাজ্য সম্পাদক সুনীল বিশ্বাস। পাশাপাশি দুটো ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে:

ফ্রেণ্ড্স ইউনিয়ন মাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক যুবক উদাত্ত কণ্ঠে বলছেন, "পক্ষপাতিত্ব সরকারি কর্মচারীদের শোভা পায় না। সরকারি বাড়ি ফূর্তির জন্য দেওয়া হয় না। সরকারি গাড়ি করে নিজের কাজ করা যায় না। দল আর সরকার এক জিনিস নয়। সরকারি সুবিধা দলের কাজে ব্যবহার করা যায় না। আপনারা নিজেদের সংশোধন করুন। না হলে জনগণ আপনাদের টেনে ছুড়ে ফেলে দেবে।"

আর পার্টিঅফিসের চেয়ারে বসে এক প্রৌঢ় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলছেন, "সরকারি গাড়ির অপব্যবহার কাকে বলে? সরকারি গাড়ি করে যদি স্ত্রীকে অফিসে পৌঁছে দেয়, খুব কি অন্যায়? যে বলে তার রুচিবোধ নেই। যদি মেয়েকে স্কুলে ড্রপ দিয়ে দেয়, অন্যায়? যে বলে তার মানবিক রুচিবোধ নেই।"

কামাল দুজনের সামনেই বসে আছে। সে কার কথা শুনবে? পুরো উলটো কথা বলার জন্য জনগণ কি তাঁকে টেনে ছুড়ে ফেলে দেবে না?

কামালের রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়ল,

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

না, সে কবিগুরুর সেই ঘৃণার দহনের তৃণ হবে না। সে বরং অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে।

ততক্ষণে টিভি-তে লালপার্টির রাজধানী কমিটির জেলা সম্মেলনে সুনীল বিশ্বাসের ভাষণ দেখাচ্ছে। তিনি বলছেন, "একজন আই. পি. এস অফিসার বিরোধীদলের নেতার মতো কথা বলছেন। অনেকে তো গিয়েছেন, আরও একজন যাবেন।" বলেই তিনি বোধহয় হাততালির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজনের খেয়াল হল। একটু দেরিতে হলেও হাততালি দিলেন। দেখাদেখি অন্যরাও। তিনি উৎসাহ পেয়ে বলতে শুরু করলেন, "আমাদের পার্টি আমলাদের নয়, সদস্যদের ওপর নির্ভর করে চলে।" কামালের মনে হল, সেটা একদিন চলত। এখন পুলিশ আর আমলা ছাড়া

ভোট চলে না। চললে অসৎ অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে হত না। অনেকে বিরোধীপক্ষে গিয়েছেন বলছেন। তাঁরা তো আপনাদের প্রিয় ছিল। রণেন ভট্টাচার্যের মতো দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার কম হয়। ভিজিল্যান্স তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণও দিয়েছিল। তাসত্ত্বেও আপনারা তাকে পুলিসের সর্বোচ্চ পদে বসিয়েছিলেন। কেন? আপনাদের পার্টি আমলাদের ওপর নির্ভর করে চলে না, তা প্রমাণ করার জন্য? না, তাকে দিয়ে পার্টির জন্য কাজ করানোর জন্য? ন্যায়সঙ্গত কাজ করানোর জন্য কি অসৎ লোককে বসানো? অবসর নেওয়ার পর তিনি বিরোধীদলে যোগ দেওয়ার কারণ, আপনাদের কাছে আর বেশি কিছু পাওয়ার আশা তাঁর ছিল না। কামাল মন্ডল কি তাঁর মতো? তাকে বিরোধীপক্ষে যেতে বলছেন? বিরোধীরা তেমন শক্তিশালী নয় বলেই তো বলছেন। শক্তিশালী হলে বলতে পারতেন না। জিভে আটকে যেত। কিন্তু আপনাদের এই অন্যায় দম্ভই জনগণকে তাদের দিকে ঠেলে দিয়ে শক্তিশালী করবে।

ফোনের শব্দে কামালের ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। মিউট টিপে ফোনটা ধরতে ওপার থেকে বললেন, "আমি উত্তর জেলার লালপার্টির অজিত নন্দী বলছি।"

কামাল চিনতে পারল না। তবু বলল, "নমস্কার! বলুন।"

"সুনীল বিশ্বাস অন্যায়ভাবে আপনাকে গালাগাল করছে। আপনি কিছু বলছেন না কেন?"

কামাল ভাবছিল এ-কথার কি উত্তর দেবে।

সে বলে চললেন, "সুনীল বিশ্বাস পার্টির হোলটাইমার। সাড়ে সাত হাজার টাকা ভাতা পান। স্ত্রী স্কুলে পড়ান। সেই টাকাতে মেয়ের বিয়েতে তিন জায়গায় পার্টি হয়? গরিব মানুষের নেতা ভাতার টাকায় লাখ টাকার ধনীর হোটেল ভাড়া করে হাজার অতিথিকে হাজার টাকার প্লেট খাওয়ান কি করে?"

কামাল কিছু বলার আগেই সে ফোন ছেড়ে দিল।

কামাল বুঝতে পারল না, সে সত্যিই লালপার্টির লোক কি না। হলে পার্টির নেতার বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে কেন? বোঝার জন্য সে কবিতা দত্তকে ফোনে ধরল।

কবিতা দত্ত পেশায় আর্কিটেক্ট। নেশায় লালপার্টির অন্ধ-উগ্র সমর্থক।

যে কোনওপ্রকারে লালপার্টিকে ক্ষমতায় রাখার ব্যাপারে তার কোনও দ্বিধাদন্দ্ব নেই। কেউ লালপার্টির বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই তেড়ে ঝগড়া করে। কামাল বাড়ি তৈরির ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু রাজনীতির কথা সন্তর্পণে এড়িয়ে যায়। কথা উঠলে আর রক্ষে নেই। কবিতা চিৎকার-চেঁচামেচি করে প্রমাণ করে ছাড়বে, লালপার্টির কোনও বিকল্প নেই। হতে পারে না। দোষ কিছু পার্টির নেতারা করছে। তাদের তাড়াতে হবে। লালপার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে। কবিতার কাকা, অকৃতদার শরৎ দত্তও লালপার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক। তবে তিনি কবিতার মতো উগ্র নন। দুজনের মধ্যে একটাই মিল। দুজনের কেউই পার্টির কাছ থেকে কোনও সুবিধা আশা করেন না। কিন্তু পার্টির জন্য সবসময় কাজ করে যান।

কামালের মনে হয়, এ-রকম অজস্র সমর্থকের জন্যই এখনো লালপার্টি দাঁড়িয়ে আছে। আর সুবিধা ভোগ করছে কিছু স্বার্থপর নেতা। যাই হোক, উত্তর জেলায় ওই নামে কোনও লালপার্টির নেতা আছে কি না কবিতা বলতে পারবে।

সব শুনে কবিতা বলল, "আমি তো ওই নামে কোনও নেতার কথা মনে করতে পারছি না। আমি কি অম্বরদাকে জিজ্ঞেস করব?"

কামাল আপত্তি করে বলল, "না, না। তার কোনও দরকার নেই।"

"আপনার দরকার না থাকতে পারে। আমার আছে।"

"কি দরকার?"

"পার্টির নেতা হয়ে পুলিশের অফিসারের কাছে পার্টির নেতার দুর্নীতির অভিযোগ করছে।"

"অভিযোগটা সত্যি কি?"

"আমি বলতে পারব না। বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি যাইনি। তবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে আমাদের নেতাদের কাছে ধনী লোকেরা আসছে। তারা নিমন্ত্রণ করছে। মেলামেশার ফলে আমাদের নেতাদের মধ্যেও লোক-দেখানো খরচের প্রবণতা বাড়ছে। ক্ষমতায় থাকার ফলে সহজে অর্থও চলে আসছে। কাজেই অসম্ভব নয়।"

"তাহলে ভদ্রলোকের ওপর অত রাগ করছেন কেন?"

"আপনার মাথায় তো গোবর পোকা। আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনি শুধু আমাদের পার্টি কি অন্যায় করল তা-ই দেখতে পাবেন। শুনেই

চিৎকার করতে থাকবেন। আর ওরা দূর থেকে মজা দেখবে। নিশ্চয় ওরা পার্টির শৃঙ্খলার কোনও ব্যাপার নিয়ে সুনীল বিশ্বাসের ওপর চটা। কাজেই সুনীল বিশ্বাস কাদায় পড়লে ওদের মজা। আপনি ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। মেয়ের বিয়েতে ধারদেনা করে একটু খরচ যদি করেই থাকে, এমন কি অন্যায় করেছে? যে ফোন করেছিল সে দেখুন তার থেকে অনেক বড়ো অন্যায় করে বসে আছে। থামুন আমি খোঁজ লাগাচ্ছি।"

কামাল ফোন ছেড়ে দিয়ে কবিতার কথাগুলির কথা ভাবছিল। ভালো লাগছিল না। আবার টিভি-টা খুলল। ঘোরাতে ঘোরাতে দেখল, ই. টিভি-তে রামভরসা আচার্যের দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনের দৃশ্য দেখাচ্ছে। দেখে মনে হল, বন্যা দুর্গতরা বেশ সুখেই আছে। অভিযোগ-অনুযোগ কারও নেই। দুয়েক জন আর কি কি করা যায় সেই সুপারিশ করছে। তিনি চলে যেতেই ক্যামেরা সাধারণ দুয়েকজন মানুষের কথা রেকর্ড করেছে। সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছে, "আপনারা মুখ্যমন্ত্রীকে আপনাদের অসুবিধার কথা, বন্যাত্রাণের অব্যবস্থার কথা বললেন না কেন? একটি সাধাসিধে মেয়ে বলছে, "তিনি আসার আগে তো স্থানীয় নেতারা এসে কারা কারা কোথায় থাকবে, কে কি বলবে ঠিক করে দিয়ে গেল।"

কামালের মনে হল, পুরোটা একটা নাটকের দৃশ্যের মতো পূর্বপরিকল্পিত ছিল। তিনি বন্যার্তদের দেখতে গিয়েছিলেন, দেখানো হল। দুর্গতরা তাদের কথা সত্যি করে বলতে পারল না।

কামাল চ্যানেল বদল করে তারানন্দে দিল। দেখল, তাদের ওখানকার লালপার্টির নেতা হরেন দাসের বক্তব্য দেখাচ্ছে। হরেন দাস বলছে, "কামাল লোকের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে সোসাইটিতে চাকরি দিয়েছে।"

এই অভিযোগের কথা টিভি-র সাংবাদিক কামালকে আগেই জানিয়েছিল। কামাল কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তখন তারা ক্যামেরার বাইরে বোঝার জন্য জানতে চেয়েছিল।

কামাল খুব সংক্ষেপে তাকে বলেছিল, "আমি আমার আনন্দ পুরস্কার ও বইয়ের রয়্যালটির টাকা দিয়ে প্রাইমারী স্কুল করি। এলাকার লোক কলেজ করার জন্য অনুরোধ করে। কলেজ করার সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লোকের কাছ থেকে নিতে হয়েছে। কেউ টাকা দিয়েছে। কেউ জমি। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য. পঁচাত্তর বিঘে জমি জোগাড়

করতে হয়েছে। কারও পাঁচ কাঠা, তো কারও পাঁচ বিঘে জমি পড়েছে। জমি থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত। জমি দিয়ে দেওয়ার ফলে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাড়ির কাউকে সোসাইটিতে কাজ দেওয়া হয়েছে। আর সেটা দেখে, যার ওই এলাকায় জমি নেই, সে চাকরি পাওয়ার জন্য জমি কিনেও সোসাইটিকে দিয়েছে। জমি তো কেনা দেখানো হয়েছে। হিসাব ঠিক রাখার জন্য সেটা ডোনেশান দেখানো হয়েছে। প্রতিটি দান সোসাইটিতে জমা পড়েছে। কারও পকেটে ঢোকেনি। কে সেটাকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া বলে উল্লেখ করছে? লালপার্টির নেতা হরেন দাস, যারা এই কদিন আগেও পঞ্চায়েতে 'জব অ্যাসিস্ট্যান্ট' নিয়োগ করার সময় প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করে ভাগ-বাটোয়ারা করেছে। সে-টাকা কোথাও জমা পড়েনি।

সে এখন যেখানে কাজ করে সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে অনুসন্ধানের জন্য আসে। ভিজিল্যান্স ম্যানুয়াল অনুসারে ভিজিল্যান্স কমিশনও কিছু অনুসন্ধানের জন্য পাঠায়। কিছু অভিযোগ তাই সরাসরিও আসে। তার এখানে আসার আগে নীলগঞ্জের প্রাক্তন বি. ডি. ও সুবাস বিশ্বাসের নামে গোটা দশেক দুর্নীতির অভিযোগ আসে। তার অন্যতম ছিল 'জব অ্যাসিস্ট্যান্ট' নিয়োগ করার সময় দু-আড়াই লাখ টাকা করে ঘুষ আদায় করা। অনুসন্ধানে জানা যায়, ক্ষমতাসীন লালপার্টির নেতাদের সহযোগিতায় একমাত্র সভাপতি আরমান আলির ছেলে এবং নেতা খাকসার আলির স্ত্রী ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই বি. ডি. ও-র হাত দিয়ে ঘুষ নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারা হয়। মন্ত্রী মনসুর রহমানও তাতে জড়িত ছিলেন। বাবুলবোনার এক লাল নেতার কাছ থেকে টাকা ঘুষ আদায় করা হয়। তা নিয়ে পার্টিতে গন্ডগোলও হয়। স্বাভাবিকভাবে সে-টাকার কোনও হিসেব কোথাও নেই। যারা নিজেরা ঘুষের টাকা আদায় করে পকেটে পোরে, তারা ডোনেশানকে দোষ দেয় কোনও মুখে?"

ততক্ষণে পর্দায় খাকসার আলির বক্তব্য দেখাচ্ছে। খাকসার বলছে, "কামাল মন্ডল সাহায্য নিয়ে হোস্টেল করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে বেশি টাকা আদায় করছে। মন্ত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাইটার্সে বলেছেন। তার জন্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখেছেন।"

মনসুর রহমান বেশ কিছুদিন থেকেই তাদের সোসাইটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন

জায়গায় বলছিলেন। কিন্তু সরকারি অফিসারদেরও যে সোসাইটির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিচ্ছেন, এটা খাকসার আলি না বললে এত পরিস্কার হত না।

কামাল ভাবার চেষ্টা করছিল, মনসুর কেন এ-রকম করছেন।

৫

মনসুর নীল-পরিবারের ছেলে। পরবর্তীকালে হাওয়া বুঝে লাল হন। কামাল প্রথম যখন শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের জন্য সোসাইটি তৈরি করেন , প্রাইমারী স্কুল করেন তখন মনসুর একটা মাদ্রাসায় পড়াতেন। পাশাপাশি ভোটে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন। এলাকার এম. এল. এ হিসেবে মন্ত্রী ছিলেন তার শিক্ষক নাজির আহমেদ। সর্বশিক্ষার টাকা ঠিক মতো কাজ না করিয়ে পার্টির লোকদের পাইয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করায়, পার্টির নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। তাকে আর টিকিট দেওয়া হয় না। মনসুরকে টিকিট দেওয়া হয়। জিতলে নাজির আহমেদ সাহেবের জায়গায় তাঁকে মন্ত্রীও করা হয়। কামাল যখন কলেজ প্রতিষ্ঠার মিটিং ডাকে সেই মিটিঙে যে প্রিপারেটরী কমিটি গড়া হয় তাতে মূল উদ্যোক্তা হিসেবে কামাল সেক্রেটারী, এবং এলাকার এম. এল. এ ও মন্ত্রী হিসেবে তাকে সভাপতি করা হয়। কামাল এলাকার বিভিন্ন লোকের সহযোগিতা নিয়ে যে কলেজ করেন তাতে তারও সহযোগিতা ছিল। অন্তত কোনওরকম বিরোধিতা করেননি।

পরের বছর এস. টি. ভি. টি হয়। তার পরের বছর ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সে-বছরেই বিধানসভার ভোট ছিল। লালপার্টি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নামে ভোট চাইতে গেলে বিপত্তি শুরু হয়।

লালপার্টির তরফ থেকে কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করার জন্য সাফল্য দাবী করা হয়। পালটা নীলপার্টি থেকে প্রচার হয়, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লালপার্টি করেনি, নীলপার্টি করেনি, এলাকার লোকের সাহায্য নিয়ে করেছে কামাল মন্ডল। মূলত তখন থেকে মনসুর রহমান ও লালপার্টির অন্যান্য নেতারা সোসাইটির ওপর বিদ্বিষ্ট হন। তাঁরা সোসাইটিতে ঢুকতে চান। দখল নিতে চান।

বিদ্বিষ্ট হওয়ার বড়ো কারণ সোসাইটির দখল নিতে ব্যর্থ হওয়া। সাধারণ

কলেজের মিটিঙে দেখা হত। তাতে মনসুর রহমান খুব কম করে হলেও বার পাঁচেক সোসাইটিতে লালপার্টির নেতাদের নেওয়ার জন্য কামালকে অনুরোধ করেন। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠই লালপার্টির সদস্য বা সমর্থক। কিন্তু তারা গ্রামের বাইরের লালপার্টির ওপরের দিকের নেতাদের সোসাইটিতে নিতে একদম রাজি নয়। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা সোসাইটিটা গড়তে নয়, সোসাইটি থেকে ফায়দা তুলতে আসতে চায়। তাদের সে-অভিযোগ মিথ্যাও নয়। কামাল একটা মীমাংসার চেষ্টা করেছিল। মনসুর রহমান, বা তার স্কুলের শিক্ষক দলীপ সরকার, বা তার স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক আতিকুর রহমান রাজি হলে সোসাইটিতে নেওয়া যেতে পারে। কারণ লালপার্টির সদস্য হলেও তাঁদের আলাদা একটা পরিচয় আছে, এবং তাঁদের সম্পর্কে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের এই আস্থা তখনও ছিল যে, তাঁরা রাজনীতি করলেও প্রতিষ্ঠানটা নষ্ট করে রাজনীতি করবেন না। কিন্তু পার্টি যাকে ঠিক করে দেবে, তাকে নিতে কেউ রাজি ছিল না। এবং সে-ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি নস্যাৎ করার মতো নয়। তাদের বক্তব্য, আজ এ পার্টি ভোটে জিতছে। বলছে, একে নাও। কাল ও-পার্টি জিতবে। বলবে, ওকে নাও। তা করতে গেলে সোসাইটি চলবে না। কামাল তবুও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাধারণ কলেজ থেকে তাকে অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক দূরে সরিয়ে দেওয়ার পর তার মনে হয়েছে যে, অন্যান্য সদস্যরা অন্তত এই ব্যাপারটায় তার থেকে লালপার্টির নেতাদের অনেক বেশি চেনে।

সোসাইটির দখল নিতে ব্যর্থ হয়ে লালপার্টির নেতারা আরেকটা সোসাইটি গঠন করল এবং পাশাপাশি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রাইমারী স্কুল এবং কলেজটা দখল করার জন্য মনস্থির করল।

নতুন করে সোসাইটি গঠনে কামালের কোনও আপত্তি ছিল না। যদি নতুন সোসাইটি প্রতিযোগিতার জায়গা থেকেও ভালো কাজে নিযুক্ত হয়, এলাকার উন্নতি হবে। কি ভাবে সোসাইটির নিয়ম-নীতি তৈরি করতে হয়, কি ভাবে রেজিস্ট্রি করতে হয়, তা তার জানা ছিল। সে করে দিল। নতুন সোসাইটিতে সভাপতি হলেন মনসুর রহমান। তাঁর ইচ্ছে অনুসারে সোসাইটির নাম হল সেবা। তাকে সহ-সভাপতি করা হল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ সেক্রেটারী করা হল তার শিক্ষক নীলপার্টির দলীপ সান্যাল মহাশয়কে। প্রাথমিক ভাবে সোসাইটি ফুটবল টুর্নামেন্ট চালাল। সেবা নামে একটা পত্রিকা

বের করল। সম্পাদক করা হল তার সহপাঠী কামরুল আলমকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই গোলযোগ দেখা দিল। সোসাইটিকে কোনও কোনও নেতা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে বলে লালপার্টিতে অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, পালটা অভিযোগে সোসাইটির কাজ শিকেয় উঠল। কামালের সোসাইটির সদস্যদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হল। নেতাদের নিলে তাদের সোসাইটির অবস্থাও ও-রকমই হত। ডামাডোলের মধ্যেও কোনওরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। লালপার্টির নেতারা ভেবেছিল, সোসাইটিতে দলীপ সান্যালকে নিয়ে, তিনি যেহেতু যে কোনও কাজে ডাকলেই লাফিয়ে পড়েন, তাঁর মাধ্যমে নীলপার্টির লোকদের লাল করে ফেলবেন। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে যখন লালপার্টির প্রার্থীকে হারিয়ে দলীপ সান্যাল জয়ী হয়ে গেলেন, তখন তারা বুঝলেন যে, বাস্তবে হয়েছে তার উলটো। না হলে তাদের নিরাপদ আসনে কি করে নীলপার্টির দলীপ সান্যাল জেতেন? সোসাইটির মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল।

কিছু গড়তে না পারলে যা গড়া আছে তার দখল নাও! কাজেই কলেজের দখল নেওয়া আরও অগ্রাধিকার পেল। তাদের সামনে সুযোগও এসে গেল।

কলেজ এতদিন প্রিপারেটরী কমিটি গড়ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে এবার গভর্ণিং বডি গড়তে হবে। এ-ব্যাপারে রাজ্য উচ্চশিক্ষা কাউন্সিল, পদাধিকার বলে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী যার সভাপতি এবং রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাইস চ্যান্সেলররা যার সদস্য, একটি মডেল তৈরি করেছিল। সে অনুসারে বেসরকারি মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে প্রতিনিধি থাকবে:

১. শিক্ষক কর্মচারীদের ২ জন;
২. অশিক্ষক কর্মচারীদের ১ জন;
৩. অভিভাবকদের ২ জন;
৪. ছাত্রদের ১ জন;
৫. ৫০,০০০ বা তার বেশি দান করেছেন তেমন দাতাদের ১ জন (দাতার সংখ্যা ৫ জন পর্যন্ত হলে) বা ২ জন (৫ জনের বেশি হলে);
৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন (যিনি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন না);
৭. সরকারের ১ জন (মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হলে

ভালো হয়)

৮. পঞ্চায়েতের সভাপতি বা পৌরসভার পৌরপিতা (পদাধিকার বলে)।

৯. বলা হয়েছে, অধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হবেন সচিব (পদাধিকার বলে)।

১০. আরও বলা হয়েছে যে, উপরোক্তরা মিলে নিজেদের মধ্যে থেকে (ওই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে) বা বাইরে থেকে কাউকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

কিন্তু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় যে আদেশ জারী করল তাতে উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের (রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী যার সভাপতি এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সমেত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা যার সদস্য) এই নির্দেশ এমনভাবে পরিবর্তন করা হল যে পরিচালন সমিতি পুরোপুরিভাবে শিক্ষক কর্মচারীদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সঙ্ঘের নেতাদের হাতে যায়।

যে পরিবর্তনগুলি করা হল তা হল:

১. অভিবাবকদের কোনও প্রতিনিধি রাখা হয়নি।

২. দাতাদের নুন্যতম দানের পরিমাণ ৫০,০০০ থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ করা হয়েছে যাতে সদস্য হওয়ার যোগ্য দাতা না হয় বা হলেও কম হয়। আর দাতাদের সংখ্যা যতজনই হোন তাঁদের প্রতিনিধি ২ থেকে নামিয়ে ১ জন করা হয়েছে।

৩. শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধি ২ জন থেকে বাড়িয়ে ৪ জন করা হয়েছে।

৪. অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধি ১ জন থেকে বাড়িয়ে ২ জন করা হয়েছে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ১ জন থেকে বাড়িয়ে ২ জন করা হয়েছে। (প্রতিনিধি যে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন না সে শর্ত তুলে দেওয়া হয়েছে।

৬. সরকারের প্রতিনিধি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হলে ভালো হয় সে-শর্তও তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফলে কোনও মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে ১২ থেকে ১৫ জনের

পরিচালন সমিতিতে ৮ জন শিক্ষক হতে পারেন। অন্য মহাবিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক সমিতির সভাপতিও হতে পারেন। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে এই সমিতির অধীনে কাজ করতে হবে। যেখানে অধ্যক্ষের মূল কাজটাই শিক্ষকদের কাজ দেখে নেওয়া সেখানে কোনও অধ্যক্ষের পক্ষে সুষ্ঠভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। যার ফলে এখন আর কেউ অধ্যক্ষ হতে চান না। রাজ্যের অধিকাংশ মহাবিদ্যালয়েই তাই অধ্যক্ষ পাওয়া যাচ্ছে না।

কলেজের শিক্ষকরা বুঝলেন যে, খুব শীঘ্রই নতুন গভর্ণিং বডি তৈরি হতে যাচ্ছে। তাতে তারা যা বলবে তা-ই শেষ কথা। কাজেই কাউকে পরোয়া করে চলার আর দরকার নেই। কলেজে যারা শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রিন্সিপ্যাল কলেজের কাছে গ্রামেই বাসা নিয়েছিলেন। দুয়েকজন জেলা শহর ভুবনপুরে বাসা নিয়েছিলেন। তারা বাসে করে এসে নীলগঞ্জে নেমে সাইকেল বা ভ্যানে কলেজে আসতেন। স্বাভাবিকভাবেই সবসময় ঠিক সময়ে আসতে পারতেন না। আর বিকেল হলেই কখন রওনা হবেন, সেই চেষ্টায় থাকতেন। বাকিরা নীলগঞ্জে মেসে থাকতেন। তারা শুক্রবারের বারোটার পর এবং সোমবার দুটোর আগে কোনও ক্লাস নিতে চাইতেন না। শুক্রবার আসলেই রাজধানী বা কাছাকাছি তাঁদের বাড়িতে চলে যেতেন। শনিবার রবিবার কাটিয়ে সোমবার ফিরতেন। প্রিন্সিপ্যাল কড়া ধাতের শৃঙ্খলা পরায়ণ মানুষ বলে, এবং নিজে সকালে কলেজে এসে রাত পর্যন্ত কাজ করতেন বলে লেকচাররা খানিকটা সমঝে চলতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নতুন গভর্ণিং বডি ঘোষণা করতেই সুর পালটে গেল। তাঁরা ঠিক মতো আসা কমিয়ে দিলেন। কামাই করতে লাগলেন। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস কামাই হতে লাগল।

কামালরা প্রথম থেকে চেষ্টা করেছিল যাতে মহাবিদ্যালয়ে এসে ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবে শিক্ষা পায়। তার জন্য তারা বরাবর চেয়েছিল যাতে পুরো পাঠক্রম শেষ হয়। তার জন্য যতদিন সম্ভব বেশি ক্লাশ দেওয়া এবং সে-ক্লাশগুলো যাতে ঠিকভাবে হয় তা দেখা। সব ছাত্রছাত্রী যাতে ঠিক মতো ক্লাশ করে তাও দেখা হত। কোনও ছাত্র বা ছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে তার অভিভাবকের কাছে চিঠি পাঠানো হত। কিন্তু দেখা গেল যে কোনও কোনও শিক্ষক অন্যায়ভাবে ক্লাশে যেতে চাচ্ছেন না। কেউ আবার মহাবিদ্যালয়েই আসছেন না। এটা যখন বাড়াবাড়ি মাত্রায় গেল তখন তারা খোঁজখবর নিতে

লাগল। তখন অনেক কিছু সামনে এল।

যেমন, দেখা গেল যে, ভূগোলের একজন শিক্ষক যে-সময়ের জন্য অসুস্থ বলে চিকিৎসকের নির্দেশপত্র দিচ্ছেন সে-সময়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের নিয়োগপত্র নিয়ে কাজ করছেন, অন্য জায়গায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং সেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের সই জাল করেছেন। কামাল অধ্যক্ষকে বলল, "ব্যবস্থা নিন।" তিনি জানালেন, "মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।" তার ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য মনে হল না। সে নিজে নিয়মকানুন দেখতে লাগল। দেখল, এ-ব্যাপারে একটা আইন আছে। তার নাম 'পশ্চিমবঙ্গ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক (চাকরির নিরাপত্তা আইন, ১৯১৯)। নাম দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, আইনটা মূলত প্রণয়ন করা হয়েছে মহাবিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা বিধানের জন্য। তাঁরা যাতে সুষ্ঠভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন তার সে-রকম কোনও বিধান সেখানে নেই। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে সেটা বলা আছে। সে ব্যাপারগুলো ভালোভাবে দেখে বলল, "নেওয়া যায়।"

নেওয়ার জন্য খোঁজখবর নিতে শুরু করল। খোঁজ নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান তাদের শিক্ষকের শিক্ষক ছিলেন। তিনি কোনওরকম সাহায্য তো করলেনই না, উলটে অধ্যক্ষকে ভয় দেখালেন যে, তিনি মহাবিদ্যালয় সেবা নিগমের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর (আমাদের শিক্ষকের) বিরুদ্ধে কোনওরকম ব্যবস্থা নিলে তিনি দেখবেন যাতে আমরা আর কোনও শিক্ষক না পাই। অধ্যক্ষের কাছে ফোনে এ-কথা শুনে কামালের বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছিল। তার জন্য সে তাঁকে ফোন করল। তিনি বোঝাতে চাইলেন, সে (অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক) অন্য জায়গায় কাজ পেয়েছে। চলে যাবে। কামাল তার কিছুই করতে পারবে না। খোঁজ নিতে কেন পাঠিয়েছে? কামাল অধ্যক্ষকে ফোনে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল। নিবন্ধক ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের আংশিক সময়ের নিয়োগের বিবরণ এবং অন্যান্য বিষয় জানালেন।

কামাল ব্যাপারটা প্রস্তুতি কমিটির সভায় তুলে আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান শুরু করার জন্য বলল। অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা হল। অনুসন্ধান শুরু হলে অভিযুক্ত শিক্ষক দোষ স্বীকার করলেন। তখন তাঁর

কাছে জানতে চাওয়া হল, কেন তাঁকে বরখাস্ত করা হবে না। তিনি কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলেন না। তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

কয়েকদিন পরে অধ্যক্ষ জানালেন যে, সভাপতি মহাশয় বরখাস্তের চিঠি না পাঠিয়ে আরেকটা সভা ডাকতে বলেছেন। সভা ডাকা হল। সভা শুরু হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কয়েকজন শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ কথা বলতে চাইলেন। তাঁরা যেটা বোঝাতে চাইলেন তা হল, ওই শিক্ষক ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলেছে। ছেড়ে দেওয়া হোক। কামাল তাঁদেব কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে, ভেবেচিন্তে সই জাল করাকে ভুল বলা যায় না। যেখানে চাকরি করছেন সেখানকার অনুমতি না নিয়ে, কাজে ফাঁকি দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি করে অন্য জায়গায় চাকরি করা ভুল নয়। পরিকল্পনা করে চিকিৎসকের অসুস্থতার নির্দেশপত্র দাখিল করা ভুল নয়। (উল্লেখ করা দরকার যে কামালরা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় চিকিৎসা পর্ষদে দরখাস্ত করেছিল। তদন্তে চিকিৎসক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।) এগুলো পরিকল্পিত অন্যায়। যা হোক, তাঁরা চলে গেলে আবার সভা শুরু হল। সভায় কয়েকজন সদস্য দোষী শিক্ষকের শাস্তি লাঘব করার আবেদন করলেন। দেখা গেল যাঁরা এটা বলছেন তাঁরা সকলেই লালপার্টির সক্রিয় সদস্য। (উদ্দেশ্য শিক্ষকদের খুশি করে গভর্ণিং বডির দখল নেওয়া।) অন্য কোনও সদস্য তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন না। সাজা বহাল থাকল। শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ছাত্র প্রতিনিধি সাজার বিরুদ্ধে মত দিলেন। শিক্ষক প্রতিনিধির কথা বোঝা যায়। ছাত্র প্রতিনিধির বাধ্যবাধকতার কারণও ছিল লালছাত্র সংগঠন করা।

শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর শুরু হতেই অধ্যক্ষ সরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কামালরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখেছিল। আশা ছিল, বালিকা মহাবিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নেওয়া আছে। সেটা পার করে দিতে পারলে হয় তো তাঁকে ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু তা হল না। ছুটি শেষ হবার পর তিনি স্বেচ্ছাবসরের জন্য দরখাস্ত জমা দিলেন। তাঁকে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হল। নতুন অধ্যক্ষ জোগাড় করে নেওয়ার জন্য শুধু কয়েকমাস সময় চাওয়া হল। লেখা হল। কিন্তু কাউকে রাজি করানো গেল না। কেন গেল না এবং কেন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও

ব্যবস্থা নেওয়া যায় না সেটা তার জানা হয়ে গেছে। সেটা হল, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠনের দায়িত্বহীন ক্ষমতার কুক্ষিকরণ। দল মত নির্বিশেষে তাঁরা একটা সংগঠন করেন। সুবিধার জন্য ক্ষমতাসীন দলের লোকদের সামনে রাখেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ভাবতে পারেন, এতে তাঁদের নির্বাচনে সুবিধা হয়। সত্যি হয় কি না সেটা ভেবে দেখার বিষয়। তবে এর ফলে যেটা হয় তা হল, কোনও মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি কিরকম হবে, পরিচালন সমিতিতে কারা যাবেন সেটা সংগঠনের নেতারাই ঠিক করেন। ফলে তাঁদের নেক নজরে থাকা কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঠিক মতো কাজ না করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। কিন্তু তার জন্য কোনও জবাবদিহি তাঁদের করতে হয় না। তাঁর জন্য অধ্যক্ষ বা উপাচার্য যাঁরা আছেন তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের কথায় ওঠবস করতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও একই অবস্থা। কামালরা তাদের ভূগোলের শিক্ষককে বরখাস্ত করল। আইন অনুসারে শিক্ষক ৩০ দিনের মধ্যে সে আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারেন। তিনি তা করলেন না। তাঁর বদলে তিনি দশ দিন সময় বাড়াতে বললেন। কামালরা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাল, ৩০ দিনের সময়সীমা রাজ্যের বিধানসভা বেঁধে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সে-সীমা বাড়াতে পারে না। তাঁরা সে-কথায় কোনও কর্ণপাত করলেন না। তাঁর দরখাস্ত উপাচার্য নির্বাহী পর্ষদে পাঠালেন। ১৩-০৬-১৩০২ তারিখের সভায় সেটা উঠল না। ০৩-০৭-১৩০২ তারিখের সভায় উঠল। তাঁরা সময় বাড়িয়ে দিলেন। বাড়ালেন প্রার্থনার থেকে অনেক বেশি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন সময়সীমা (২৬-০৫-১৩০২) থেকে ১০ দিন। তাঁরা বাড়ালেন সভার দিন (০৩-০৭-১৩০২) থেকে ১ মাস।

প্রথমত ৩০ দিনের সময়সীমা বিধানসভায় পাস হওয়া আইন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সে-আইনে এই সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনও ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কর্তপক্ষকে দেওয়া হয়নি। কাজেই সময় সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনও ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই।

ক্ষমতা থাকলেও, বিনা কারণে সময় বাড়ানো যায় না। বরখাস্ত হওয়া শিক্ষক তার দরখাস্তে কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সময় বাড়ানোর জন্য কোনও কারণ দেখায়নি। দ্বিতীয়ত তিনি সময় বাড়াতে

বলেছেন, ২৬-০৫-১৩০২ থেকে মাত্র ১০ দিন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়িয়েছে ০৩-০৭-১৩০২ থেকে ১ মাস। অর্থাৎ ৩০ দিনের যে সময়সীমা বিধানসভা বেঁধে দিয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয় বাড়িয়ে ৯৯ দিন করে দিয়েছে।

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, (১) সময় বাড়ানোর ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে, (২) তিনি সময় বাড়ানোর জন্য গ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়েছেন, এবং (৩) তাঁর দরখাস্ত আগে মঞ্জুর করা যায়নি বলে কর্তাব্যক্তিরা মঞ্জুরের দিন থেকে সময় দেওয়া দরকার মনে করেছেন, তাহলেও তাঁরা ০৩-০৭-১৩০২ থেকে তাঁকে ১০ দিনের বেশি সময় দিতে পারেন না। ০৩-০৭-১৩০২ থেকে এক মাস সময় বাড়ালেন কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পর্ষদের মাননীয় সদস্যদের অনেকেই মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এটা হতে পারে না যে, তাঁরা ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক বোঝেন না। হতে পারে না যে, তাঁরা আইনের অর্থ বোঝেন না। যদি বোঝেন, তাহলে ১ মাস বাড়ালেন কেন? শুধুমাত্র এটা দেখাতে যে, তাঁদের আইন না মানলেও চলে। আইন লঙ্ঘন করলেও তাঁদের কোনও সাজা হয় না। তাঁদের সাজা দেয়, এমন হিম্মৎ কারও নেই। তাই ভাবটা এরকম, 'এই তো খুব আইন দেখাচ্ছিলি, ১০ দিনও বাড়াতে পারি না। দিলাম ১ মাস বাড়িয়ে! কি করতে পারিস, কর!' যার জন্য তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাহী পর্ষদে পাঠিয়েছেন। ১৩-০৫-১৩০২ এর সভায় আলোচিত হতে না পারার জন্য পরের সভায় গেছে এবং পরের সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভার দিন থেকে এক মাসের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

এখানেই শেষ নয়। সময় তো বাড়ানো হল। তারপর কি হল? কামালরা বারাবার জানতে চেয়েছে, তিনি বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আবেদন করেছেন কি না। করলে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের চিঠির কোনও উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করেনি। এক বছরেরও বেশি সময় এরকমভাবে কাটিয়ে দিলে তারা 'ট্রাইবুনাল'-এ আবেদন জমা দিতে বাধ্য হয়েছে।

ইউ. জি. সি-র অনুমোদন পাবার জন্য কামাল তাদের সোসাইটির থেকে বণ্ড দিয়েছিল। তার জন্য সোসাইটির অন্তত একজন প্রতিনিধি রাখার জন্য আবেদন করেছিল। পরে জানানো হবে বলে আর কোনওদিন জানায়নি। ফলে

তারা বণ্ড তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে কলেজ ইউ. জি. সি-র অর্থ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাতে তাঁদের রাজনীতির কোনও অসুবিধা হয়নি।

প্রশ্ন হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় এ-রকম আচরণ করল কেন? উত্তর, শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের অশুভ হস্তক্ষেপের জন্য। আবার প্রশ্ন হতে পারে তাঁদের হাতে যদি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সত্যিকার ক্ষমতা থাকে তো ক্ষতি কি? কোনও ক্ষতি নেই যদি তাঁদের দায়বদ্ধতা থাকে। তাঁদের নিয়ম করে ক্ষমতা দেওয়া হোক। কিন্তু সেটা অন্য কারও কাঁধে থাকবে, তাঁদের কোনও দায়িত্ব থাকবে না কিন্তু ক্ষমতা থাকবে, তাঁরা শুধু মাতব্বরি করবেন, সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁদের দায়িত্বহীন ক্ষমতা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি করছে।

হতে পারে। কিন্তু মনসুর রহমান এবং অন্যান্য নেতাদের লক্ষ্য কলেজের ক্ষমতা দখল করা। কাজেই তারা দলবদ্ধভাবে শিক্ষকদের অন্যায় কাজেরও সমর্থন করে গেল।

ফলে যখন নতুন নিয়ম অনুসারে গভর্ণিং বডির সময় এল তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় লালপার্টির এম. পি-র দাদাকে এবং নীলগঞ্জের বালিকা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকাকে নমিনি নিযুক্ত করল। বলাই বাহুল্য এটা লালপার্টির সিদ্ধান্ত ছিল এবং পার্টি করা ছাড়া তাদের নমিনি করার আর কোনও কারণ ছিল না। কারণ কামাল ওই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই সব থেকে বেশি ভূমিকা পালন করার সূত্রে জানে যে, তাঁদের দুজনের একজনও কলেজের প্রতিষ্ঠা বা উন্নতির জন্য কোনও ভূমিকা নেননি।

সভাপতি কাকে করা হবে? মনসুর রহমান অধ্যক্ষকে ফোন করে বললেন, তাঁর নাম যেন প্রস্তাব করা হয়। অন্য আর সবাই সমর্থন করায় মনসুর রহমান নতুন গভর্ণিং বডির সভাপতি হলেন। কামাল কোনওভাবে যুক্ত থাকল না।

এলাকার লোকেরা প্রশ্ন করে থাকবেন, যে কলেজটা করার জন্য সব থেকে পরিশ্রম করল, সে কেন থাকল না। একদিন একটা টেলিভিশন চ্যানেলে মনসুর রহমান সাক্ষাৎকার দিয়ে বললেন, "আমরা কামাল মন্ডলকে সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি হতে চাননি। বলা বাহুল্য, মিথ্যা কথা। টিভির লোকেরা কামালের কাছে এলে কামাল কোনও মন্তব্য না করে

এড়িয়ে গেল।

অনীকনগরে তার বন্ধু কামরুল আলমের সোসাইটির সভায় গিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, "কামালদের সোসাইটি তো ব্যবসা করছে। এই সোসাইটি যেন সে-রকম না হয়। কামাল অনীকনগরের সোসাইটিরও সভাপতি। সে একবার ভেবেছিল, জিজ্ঞেস করবে, তিনি কেন এমন বেঠিক, আপত্তিজনক কথা বলছেন। ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য করেনি।

তারপর মাঝে মাঝেই সে খবর পায় যে, তিনি নীলগঞ্জে তার ভাইয়ের দোকানে বসে কামালদের সোসাইটির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থকেন। যেদিন তাদের গ্রামের মুকুল নিজে কানে শুনে গিয়ে বলল। তবুও কামাল তিক্ততা এড়ানোর জন্য কিছু বলা থেকে বিরত থাকল।

কিন্তু মনসুর রহমান বিরত থাকলেন না। কামাল কলেজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করে এনেছিল। তাঁকে স্বেচ্ছাবসর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় যখন এল, অধ্যক্ষ আগে থেকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়ার পরও তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়া হল না। তাঁর স্বেচ্ছাবসরের মঞ্জুরী বাঞ্চাল করার জন্য তাঁকে আরও কিছুদিন থাকার অনুরোধ করলেন। অধ্যক্ষ তাতে রাজি না হয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেও তা না করে উলটে তাঁকে কলেজে না আসার জন্য চিঠি ধরানো হল। কামাল বুঝতে পারল, তাঁকে পেনশন থেকে বঞ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের প্ররোচনায় মনসুর রহমান এটা করছেন। দুটো ব্যাপার থেকে এটা পরিস্কার হল।

তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানতে চাইলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-রকম স্বেচ্ছাবসরের কোনও নিয়ম আছে কি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের এটা না জানার কথা নয় যে, এই নিয়মটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। কলেজ শিক্ষকদের স্বেচ্ছাবসরের নিয়মটা উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রণীত। কামাল ভাবতে পারে না যে, তাঁরা এতটা-ই অপদার্থ যে, তা তাঁদের জানা নেই। কাজেই তাঁরা শয়তানী করে উত্তর দিলেন, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাবসরের কোনও নিয়ম নেই। কামাল উচ্চশিক্ষা বিভাগে গিয়ে জানতে পারল যে, মনসুর রহমান সেখানেও এ-রকম একটা চিঠিই শুধু লেখেননি, সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, ডি. পি. আই, ডি. জি. পি. আই সকলকে ফোন করে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বলেছেন এবং কলেজ শিক্ষকদের জন্য এ-রকম যে কোনও

নিয়ম নেই, তা লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। সে-রকম অনুরোধ করে লোকও পাঠিয়েছেন।

কারো কারো এমন মনে হতে পারে যে, অধ্যক্ষকে স্বেচ্ছাবসরের মঞ্জুরী দেওয়ার পরও থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রাজি না হওয়ার জন্যই মনসুর এ-রকম করছিলেন। সে-রকম মনে হলে ভুল হবে তা আরেকটা ঘটনা থেকে প্রমাণিত হবে। ওই কলেজের শিক্ষক দলীপ মাইতি বাইরে গবেষণার কাজে যাবার জন্য ছুটি চান। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে স্থায়ী পদে পাঁচ বছর কাজ না করলে সে-রকম ছুটি দেওয়া যায় না। তবুও শিক্ষকদের খুশি করার জন্য তাঁকে এক বছরের ছুটি এই শর্তে দেওয়া হয় যে, তিনি ওই এক বছরের পরেই কলেজে ফিরবেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে কলেজে কাজ করবেন। সেই মর্মে তিনি কলেজে বণ্ডও দেন। কিন্তু এক বছর পর তিনি ফেরেন না। তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রসেডিং করা হয়। প্রসেডিং অনুসন্ধান করেন দলীপ সান্যাল। অভিযুক্ত শিক্ষক দলীপ সান্যালের চিঠির কোনও উত্তরই দেন না। অনুসন্ধানে তাঁর দোষ প্রমাণিত হয়। তাঁর পদ শূন্য ঘোষণা করে উচ্চশিক্ষা বিভাগকে জানানো হয়। তাঁর জায়গায় লোক দেবার জন্য কলেজ সার্ভিস কমিশনকে লেখা হয়। কিন্তু নতুন গভর্ণিং বডি হওয়ার পর সে প্রসেডিঙের রিপোর্ট চেপে গিয়ে, উচ্চশিক্ষা বিভাগে এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনে লেখার কথা গোপন করে দলীপ মাইতিকে কলেজে যোগ দিতে দেওয়া হয় এবং কিছু দিন পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, কলেজের শিক্ষকদের খুশি করার জন্য মনসুর রহমান বেআইনীভাবে দলীপকে সুবিধে পাইয়ে দেন। কেউ যদি পি. আই. এল করে, তাহলে মনসুর রহমানের সাজা হবার সমূহ সম্ভাবনা।

সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এখানে যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা হল দুজন শিক্ষকের প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ। দলীপ মাইতি কলেজকে দেওয়া বণ্ড লঙ্ঘন করেছেন। কলেজ নিযুক্ত অনুসন্ধানকারীর চিঠির কোনও উত্তরই দেননি। অনুসন্ধানে তাঁর দোষ প্রমাণিত। তাঁর পদ শূন্য ঘোষণা করে তাঁর জায়গায় লোক দিতে বলা হয়েছে। সেই দলীপ মাইতিকে সাজা তো দূরের কথা, চিঠিও ধরাচ্ছেন না। কিন্তু অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাবসর মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনি নির্দিষ্ট দিনের আগেই দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবেন বলে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। সেদিন কেউ চার্জ নিতে না চাইলেও চাজ্ রিপোর্টে সই করে মনসুরের কাছে

পাঠিয়েছেন। মনসুর তাঁকে চিঠি ধরাচ্ছেন। দলীপের বেতন পাওয়ার কথা নয়। তাঁকে বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। অধ্যক্ষের পেনসন পাওয়া উচিত। তিনি যাতে না পান তাঁর চেষ্টা করছেন। কেন? কারণ কলেজের শিক্ষকরা তাতে খুশি হবেন। তাঁকে প্রেসিডেন্ট রাখবে।

কামালের খারাপ লাগল। কামাল তাঁকে অনুরোধ করে এনেছিল। আগের জায়গায় থাকলে এখনো পাঁচ বছর চাকরি করতেন। আনার ফলে চাকরিটা তো গেল। এখন যদি পেনশানটাও না পান! সে মনসুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। অফিস থেকে জানাল, বাইরে আছেন। সে মোবাইল ফোনে ধরল। কথাটা তুলতেই ফোনটা কেটে গেল। কামাল আবার ফোন করতে শুনতে পেল, ফোনটা বন্ধ আছে। কামালের আরও খারাপ লাগল। সে ফোন করেছে। মনসুর কেটে দেন কি করে? সে অধ্যক্ষের চিঠির উত্তর নিজে তৈরি করে দিল। নিজে তার শিক্ষক আতিকুর রহমানের মাধ্যমে হরেন দাসের সঙ্গে কথা বলল। রোজ সকাল পত্রিকার সম্পাদনা অলোক সেনগুপ্তের মাধ্যমে সুনীল বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলল। সুনীল বিশ্বাস বলে থাকবেন।

তখন মনসুর ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্য তাকে কলেজে যেতে বললেন। সে গেল। কথা বলতে গেলে বর্তমান পরিচালকমন্ডলীর অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় নমিনি, লালপার্টির এম. পি-র দাদা পরিচালকমন্ডলীর সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও তার উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তুললেন। যদি কলেজ তৈরিতে তার ভূমিকার কথা ধরা নাও হয়, মনসুরের তখন জানানো উচিত ছিল যে, তিনিই তাকে ডেকেছেন। তিনি কেন সে-কথা বলতে পারেননি, তাঁরই জানা। বাধ্য হয়ে তাকে কথা বলতে হয়েছিল।

সেই কথা প্রসঙ্গে যাতায়াতের কথা এসে গিয়েছিল। তার সাধারণ বাসে এবং সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনে করে যাতায়াতের প্রসঙ্গ তুলে এম. পি সাহেবের দাদা মন্তব্য করেছিলেন, "এসব তো আপনার বিলাসিতা!" উপস্থিত মনসুর রহমানও এর কোনও আপত্তি করেননি। তাহলে কি তাকে অপমান করার জন্যই ডাকা হয়েছিল? তাঁরা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন বলে গর্ববোধ থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে কেউ সৎ থাকলে তাকে নিয়ে এ-রকম উপহাস করবেন? এতটা ঔদ্ধত্যও কি বাঞ্ছনীয়?

কামালের খুবই খারাপ লেগেছিল। মনে হয়েছিল এর প্রতিবাদ করা

উচিত। কিন্তু ওটা তার নিজের গ্রাম। তার সঙ্গে যে ব্যবহার তার গ্রামে, তার হাতে গড়া কলেজে বসে করেছে সেটা বাইরে প্রকাশ পেলে গ্রামের লোকেরা তখনই মন্ত্রী, এম. পি-র ভাই, দুজনেরই মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেবে।

কামাল এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু তাঁদের ঔদ্ধত্য সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

গাড়ির অপব্যবহারের ব্যাপারটা সেজন্যই তার মনে গেঁথে গিয়ে থাকবে এবং তাঁর প্রবন্ধে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে।

কলেজের পরিণতির জন্য তার বার বার কষ্ট হয়েছে।

হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক যে, কলেজটা সে একা তৈরি করেনি। এলাকার আর সকলের সাহায্য নিয়েই করেছে। এলাকার বাইরের অনেক লোকও সাহায্য করেছে। কিন্তু এ-কথাও তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সে-ই সব থেকে বেশি পরিশ্রম করেছে :

১. সে-ই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মিটিং ডেকেছে।
২. সে-ই অনুমতির জন্য রাজ্য উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং প্রথমে কোলকাতা পরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার গেছে।
৩. সুনীল বিশ্বাসের কাছে গেছে।
৪. লোকের সঙ্গে কথা বলে জমি জোগাড় করেছে।
৫. মিঠুন চক্রবর্তী, রানী মুখার্জি, জয়াপ্রদা, বাপী লাহিড়ী, মহম্মদ আজিজ, অনুরাধা পাড়োয়াল, গৌতম ঘোষ, ইন্দ্রনীল সেন, বিপ্লব ব্যানার্জী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অমর পাল, সাবিনা ইয়াসমিন, ফিরদৌসি রহমান প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠান করে অর্থ জোগাড় করেছে। অর্থের জন্য কয়েকজনকে সঙ্গে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে।
৬. সবকিছুর পরও সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে জানা গেল যে, তাঁরা শুধু কলা এবং বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে অনুমোদন দিতে চাইছেন। প্রথমেই বিজ্ঞান দিতে চাইছেন না। কিন্তু বিজ্ঞানই বেশি দরকার। তখন সেই একদম নিম্নস্তর থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত কথা বলে তবে বিজ্ঞান দেবার সম্মতি আদায় করেছে।
৭. অশিক্ষক কর্মচারী খুবই কম দেওয়া হলে সেই আবার গেছে। প্রহরীর পদের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ পর্যন্ত গিয়ে অশিক্ষক কর্মচারীদের মোট দশটি পদ আদায় করেছে।

৮. সেই অর্থ সাহায্যের জন্য জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর মতো ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে অর্থ সাহায্য নিয়ে এসেছে।

৯. সেই ইউ. জি. সি-র অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ নিয়ে পাঁচ-পাঁচ বার নিজের পয়সা খরচ করে দিল্লি গিয়েছে। অফিসারদের কাছে বারবার ঘুরে, চিঠি লিখে অনুমোদন আদায় করেছে।

১০. সেই সরকারি সাহায্যের জন্য এক দরজা থেকে আরেক দরজায় ঘুরেছে। পরিচিত আর্কিটেক্ট-কে অনুরোধ করে নক্সা করে নিয়ে উচ্চশিক্ষা বিভাগে জমা দিয়েছে। কনিষ্ঠ কেরানী থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সই করিয়ে পূর্ত বিভাগে হাতে করে ফাইল নিয়ে গেছে। সেখানে একই ভাবে অনুমোদন করিয়ে আবার উচ্চশিক্ষা বিভাগে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে নিয়ে গেছে রাজ্য পরিকল্পনার দপ্তরে। সেখানে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সই করিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে উচ্চশিক্ষা বিভাগে। আবার সেখান থেকে নিয়ে গেছে অর্থ বিভাগে। আবার সেই কনিষ্ঠ কেরানী থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকলের সই করিয়ে উচ্চশিক্ষা বিভাগে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর কলেজে অর্থ এসেছে।

১১. সে-ই নিজের বেতনের টাকাও কলেজ তৈরির জন্য ঢেলেছে।

১২. সে-ই নিজের সংগ্রহ থেকে কয়েকশো বই কলেজকে দিয়ে দিয়েছে।

১৩. নিজের অফিসের পর অবসরের সব সময়টা কলেজ তৈরির জন্য দিয়েছে। সেই কলেজ আছে। কিন্তু সে তার সঙ্গে নেই। লালপার্টির রাজনীতি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এ-কথা তো ঠিক, কলেজ তৈরির জন্য সে যতটা পরিশ্রম করেছে মনসুর করেনি। তবু মনসুর আছেন, সে নেই। এম. পি-র ভাই এবং প্রধান শিক্ষিকা কোনও পরিশ্রম করেননি। তবু তাঁরা এসেছেন। কামালকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কারণ লালপার্টির রাজনীতি। কারন এলাকার লোক মনসুরকে নির্বাচিত করেছেন।

কামালের কি তাঁকে পুনরায় নির্বাচনে সাহায্য করা উচিত?

সেদিন সোসাইটির কাজে এসেছিল। সোসাইটির মাঠে কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া চলছিল। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক মাইকে ঘোষণা করছিল। তার কণ্ঠস্বরে আকর্ষিত হয়ে ও-দিকে তাকাল। টেবিলের ওপর বড়ো বড়ো কাপ রাখা। মনে পড়ে গেল, প্রথম বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় সব

মিলিয়ে যে ছাত্র এবং ছাত্রী সব থেকে ভালো করবে তাদের জন্য কাপ চালু করার খুব ইচ্ছে করছিল। কলেজের টাকা ছিল না। নিজের বেতনের টাকা দিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনেছিল। কলেজে কাপগুলো আছে। সে নেই। সে একবার কাপগুলোর দিকে তাকাল। তারপর কলেজের বাড়িটার দিকে তাকাল। তার সন্তানের মতো। তার বুকের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে সে ভালো করতে চায়। কিন্তু ভালো করার জায়গায় সে নেই। লালপার্টির নেতাদের সঙ্কীর্ণ রাজনীতি তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

হরেন দাস, খাকসার আলি দুজনেই পার্টির হোল টাইমার। পার্টির কাজ করার জন্য পার্টি থেকে মাসে মাসে পয়সা নেয়। কাজেই পার্টির হুইপের বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে ভাবার ক্ষমতা নেই।

টিভি-র টিম ততক্ষণে মনসুর রহমানের গ্রাম ভিলাসপুর পৌঁচেছে। সে-গ্রামের বাসিন্দা দাবী করে যে মনসুর রহমান সার্টিফিকেট দিচ্ছে সে-গ্রামের কেউ নয়। তাকে কামাল চেনে। তার নাম জাব্বার। দক্ষিণপুরের কাইসারের ছেলে। তাদের কলেজে লালছাত্র সংগঠন করত। একমাত্র সেই যোগ্যতায় কলেজে অশিক্ষক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেছে। গ্রামের লোকের ওপর ভরসা না রাখতে পেরে তাকে গ্রামবাসী সাজিয়ে পাঠানো হয়েছে। তার বক্তব্যের সময় একজন দিনমজুর কাস্তে হাতে ফিরছিল। সাংবাদিক তার প্রতিক্রিয়া চাইতে সে বলছে, "উরা মিথ্যা কথা বুলছে। কামাল মন্ডল ভালো লোক। স্কুল-কলেজ করেছে। ছেলেমেয়েরা বাড়ির কাছেই পড়তে পাচ্ছে। আর মনসুর গাড়ি লিয়ে আসে যে। প্রায়ই আসে। দেখবো না ক্যানে? ভাই-বোন-আত্মীয়স্বজনরা সবাই চড়ে বেড়ায়। কামালের খারাপ লাগে। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ তাকে সমর্থন করছে। আর অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে জাব্বার শুধু সেই পার্টি করে সুবিধা পেয়েছে বলে মনসুরের অন্যায় কাজকে ঢাকা দিয়ে কামালের বিপক্ষে কথা বলছে। লালপার্টি এখন সুবিদাবাদীদের পার্টি হয়ে গেছে। অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কিছু লোককে হাতে রেখেছে। কোনও মূল্যাবোধের জন্য নয়, নিজেদের সুবিধার জন্য তারা লালপার্টির পক্ষে কাজ করছে। অধিকাংশ লোক সেটা না বুঝতে পেরে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এতে দেশের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। যেমন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা লালপার্টির সমর্থক হয়ে গেলে তাদের আর ঠিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার বা সব ক্লাস নেওয়ার কোনও দরকারই নেই। তাদের

সুবিধা মতো এলে, ক্লাস নিলেই চলে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তারাই সর্বেসর্বা। কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাদের অন্যায় কাজের জন্য কোনও ব্যবস্থা নিতে গেলে তারা তাকেই উলটে দিতে পারে। তাদের লালপার্টি থেকে বোঝানো হয়, অন্য পার্টি ক্ষমতায় এলে তাদের এই রাজত্ব নাও থাকতে পারে। তারা লালপার্টির হয়ে কাজ করে। শিক্ষার মান নেমে যায়। ছাত্রদের সমূহ ক্ষতি হয়। পার্টির ক্ষমতায় থাকা হয়। যারা তাদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখে তারা কিন্তু সবাই লালপার্টির সমর্থক নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যায় সুবিধা পাওযার জন্য লাল। এ-ব্যাপারে তার একটা মজার অভিজ্ঞতার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। তখন সে রাজধানীর পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান। উচ্চ মাধ্যমিকের হিন্দি প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়া এবং নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিল। তদন্তে দেখা গেল, সে লাল শিক্ষক সংগঠন করে। গ্রেপ্তারের ভয়ে সে গা ঢাকা দিলে উত্তরপ্রদেশের দেশের বাড়িতে লোক পাঠানো হল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল সে ভারতবাদী পার্টির নেতা। কি রকম সুবিধাবাদী চরিত্র। যেখানে যে-পার্টি করলে সুবিধা সেখানে সে পার্টির লোক। লাল পার্টিতে এখন অনেক সে-ধরনের সমর্থক, এমনকি কিছু নেতাও আছে। যেই হাওয়া সামান্য ঘুরবে, তারাও হাওয়া মোরগের মতো ঘুরে যাবে। এদের দেখে সঙ্কিত হবার কিছু নেই।

৬

আবার ফোন বাজল। কামাল টিভি-টা মিউট করে ফোন ধরল। রোজ সকাল পত্রিকার সম্পাদক অলোক সেনগুপ্ত বললেন, ‘‘কামাল! অলোকদা বলছি। দেখ, যদি মনে করো অনধিকার চর্চা তো অনধিকার চর্চাই করছি। তোমার লেখা নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে সে-ব্যাপারে তুমি কি ভাবছ?’’

‘‘অলোকদা, আপনি লেখাটা পড়েছেন?’’

‘‘পড়েছি। তুমি ঠিক লিখেছ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই পদে থেকে তোমার লেখাটা ঠিক কি না!’’

‘‘অলোকদা, আমি তো পুলিশের সংগঠনের একটা কাগজে লিখেছি। কি করে পুলিশকে স্বচ্ছ, সৎ, নিরপেক্ষ, ও কর্মদক্ষ করা যাবে সে-সম্বন্ধে লিখেছি।’’

‘‘লিখেছ। কিন্তু গণমাধ্যমে তো সে-সব দেখাচ্ছে না। গণমাধ্যমে দেখাচ্ছে,

মনসুর রহমান নিজের সরকারি গাড়ি ছাড়াও সংস্থার আরও পাঁচটা গাড়ি ব্যবহার করে। দেখাচ্ছে, শাসকদল পুলিশকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে।"

"অলোকদা, আপনার কাগজে আপনি কি লিখবেন, তার জন্য কি আমি দায়ী হব?"

"এ-কথাটা আমিও ওদের বলেছি। বলেছি যে, তারানন্দ চ্যানেলে কি দেখানো হচ্ছে বা সাম্প্রতিকীতে কি লেখা হল তার জন্য কামাল দায়ী নয়। কিন্তু বিব্রতকর অবস্থায় কে কার কথা শোনে? শাসকদলের লোকেরা যে বিব্রত, এটা তুমি মান?"

"কিন্তু অলোকদা, আমি নতুন তো কিছু লিখিনি। মনসুর রহমানের একাধিক গাড়ি ব্যবহারের কথা বলছেন। একাধিক বার কাগজে বেরিয়েছে। আমি শুধু তার একটা থেকে উদ্ধৃত করেছি।"

"অনেক বার তো লেখা হয়েছে। এত হইচই হয়েছে? তোমার লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা ইমেজ আছে। আর কেউ লেখা আর তোমার লেখা এক নয়, এই ব্যাপারটা তুমি বোঝ না কেন? তুমি পুলিশের বড়োকর্তা হয়ে বলছ, শাসকদল পুলিশকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করে। তোমার সৎ ও স্বচ্ছতার একটা ইমেজ আছে। কোনও লোক অবিশ্বাস করবে?"

"কিন্তু অলোকদা, ক্ষতিকর যা হচ্ছে, আমি যদি তার বিরোধিতা না করি, কোনও লোক আমাকে বিশ্বাস করবে?"

"আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি লালপার্টির নাম ধরে লিখতে গেলে কেন?"

"আপনি আরেক বার জায়গাটা পড়ুন। আমি 'প্রায় প্রতিটি রাজ্যের শাসকদল বলে' লিখেছি। অন্য কেউ তাকে বিকৃত করলে তার দায় আমার নয়।"

"কিন্তু তুমি মুনসুর রহমানের নাম তো লিখেছ।'

"আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। আমি বলেছি, পুলিশকে সৎ করতে হলে পুলিশ যাদের অধীনে কাজ করে তাদের সৎ হতে হবে। কিন্তু ওপরের লোকেরা নিয়ম ভেঙে যে-সব কাজ করে তা গণমাধ্যমে বের হলে পুলিশের লোকেরাও পড়ে। তাদের খারাপ হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। যারা নিয়ম ভাঙে তারা পুলিশকে নিয়ম মেনে চলতে বলতে পারে না। তাই আমি সুপারিশ করেছি, সেগুলোকে আইনসিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য যাতে তারা পুলিশকে

ভালো হয়ে চলতে বলতে পারে।"

"কিন্তু গণমাধ্যমে তো সে-রকমভাবে দেখাচ্ছে না। দেখাচ্ছে, মনসুর রহমান নিজের সরকারি গাড়ি ছাড়াও সংস্থার আরও পাঁচটা গাড়ি ব্যবহার করে। দেখাচ্ছে, শাসকদল পুলিশকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে।"

"গণমাধ্যমে আমি তো কিছু বলিনি। অন্যদের সঙ্গে কথা-ই হয়নি। তারানন্দের সমিত মুখার্জি আপনার কাগজে কাজ করত বলে পরিচিত। তার ক্যামেরার সামনেও আমি 'কোনও মন্তব্য করব না' ছাড়া কিছু বলিনি। বরং লালপার্টির নেতারা আপত্তিজনক কথা বলছেন।"

"কোথাকার কে কি বলছে, তার কোনও গুরুত্ব আছে?"

"শুধু কোথাকার কে নয়। আপনার বন্ধু, সুনীল বিশ্বাস কি বলেছেন, দেখুন।"

"কি বলেছে?"

"বলেছেন, আমার মানবিক রুচিবোধ নেই। কারণ আমি সরকারি গাড়ি করে স্ত্রীকে অফিসে এবং মেয়েকে স্কুলে পৌছে দেওয়া অন্যায় মনে করি। বলেছেন, আমি বিরোধী দলের নেতার মতো কথা বলি। বলেছেন, এ-রাজ্যের আই. এ. এস, আই. পি. এস অফিসারদের বেশ কয়েকজন অবসরের পর অতিনীল, নীল, ভারতবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, এবং নির্বাচনে ওই দলের প্রার্থীপদও পেয়েছেন। তিনি যাঁদের নাম বলেছেন তাঁদের অন্যতম রণেন ভট্টাচার্য। অবসরের পর তিনি অন্য পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু অবসরের আগে তো লালপার্টিতেই ছিলেন।"

"দেখো, সুনীল বিশ্বাস যা বলছে, সেটা ওর কথা নয়। তোমার নীলগঞ্জের নেতারা তার কাছে কেঁদে পড়েছে যে, এ-রকম প্রচার হলে, মনসুর হেরে যাবে।"

"পুলিশের ভাবমূর্তি ভালো করার জন্য কি করতে হবে লিখলাম। আর তাতে মনসুর হেরে যাবেন; তাই হয় না কি?"

"তারা তো সে-রকমই বলেছে।"

"আপনার বন্ধু বলছেন, 'আদর্শের আক্রমণ হলে তার জবাব দেওয়া যায়। এ-রকম জঘন্য কুৎসার জবাব দিতেও ঘৃণা হয়!' পুলিশকে নিরপেক্ষ করা আদর্শের প্রশ্ন নয়। সরকারি গাড়ির অপব্যবহার আদর্শের প্রশ্ন নয়। এই অপব্যবহারে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে; জবাব দিতেও ঘৃণা হয়।"

"জবাব দিতে অসুবিধা হলে হয়। তুমি বোঝ না কেন? যাই হোক, রণেন ভট্টাচার্য লালপার্টিতে ছিল, বলছ কেন, বলো।"

"না হলে, দুর্নীতি প্রমাণ হওয়ার পরও তাঁকে ডিজি করা হয়েছিল কেন?"

"কিন্তু অতিলাল নেত্রী নম্রতা মুখার্জি কি বলেছে, দেখেছ? 'কামালের গায়ে হাত পড়লে আগুন জ্বলবে।' এতে তোমার ভালো হবে মনে করছ?"

"ভালো করার মালিক যদি লালপার্টির নেতাদের ধরা যায়, তাহলে ভালো হবে না। তাঁরা নম্রতা মুখার্জিকে ভালো মনে করেন না। কাজেই তিনি যাকে সমর্থন করছেন তাঁরা তার বিরোধিতা করবেন।"

"দেখো, তুমি যদি মনে করো, যা ঘটছে তা সহ্য করা যায় না। তুমি তার বিরোধিতা করবে। তাতে যা হয় হবে। তুমি তার সামনা করবে। তাহলে আলাদা কথা। না হলে বলো যে, কাউকে বিব্রত করার ইচ্ছে ছিল না। লিখে ফেলেছ। সরি। তুমি কোনওটা করতে চাইছ?"

"অলোকদা, আমি কি বলতে চাই, আর তাতে তাঁদের কোনও জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে, তা নিয়ে যদি কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, আমি কথা বলতে রাজি আছি।"

"আর যদি লিখিতভাবে তোমার কাছে জানতে চায় যে, তুমি কেন এ-রকম লিখেছ?"

"তাহলে আমি বুঝে-সুঝে আইন মতো উত্তর দেব।"

"আচ্ছা, তুমি একটা সত্যি কথা বলো তো!"

"বলুন, কি জানতে চান।"

"স্থানীয় লালপার্টির নেতাদের ওপর তোমার এত ক্ষোভ কেন?"

"কেন হবে না, বলুন।"

"প্রবন্ধে যে-কারণগুলো লিখেছ, আমি পড়েছি। তার বাইরে। একদম ব্যক্তিগত লেভেলে যা মনে আসে একটা পৃষ্ঠায় লিখে আমাকে দাও তো।"

"তা দিয়ে কি হবে?"

"তুমি দাও না। আমি বুঝতে চাই।"

"কাল সকালেই আপনার হাতে পৌঁছে যাবে।"

"ঠিক আছে। এ উইক এণ্ডে তুমি এখানে আছ তো?"

"আছি।"

"আমি পরে তোমাকে ফোন করছি।"

অলোক সেনগুপ্ত ফোন ছেড়ে দিলেন।

কামাল ঠিক এভাবে ভাবেনি। ভাবতে লাগল।

৬

লিখতে শুরু করল,

আপনি জানতে চাইছিলেন, আমার এত ক্ষোভ কেন? আমি মানছি যে, প্ররোচনা যতই হোক, আমার শান্ত এবং সুশৃঙ্খল থাকাই উচিত। তবুও দুয়েকটি কথা জানাচ্ছি।

১. আমার যখন ডি. আই. জি (ও) হিসেবে পোস্টিং হল, আমি তৎকালীন ডি. জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম, "স্যার, এখানকার যা কাজ, আমি ঠিক মতো করতে গেলেই অসুবিধা হবে। আমাকে আপনি এখানে আনলেন কেন?" তিনি যা বললেন তার সোজা কথায় অর্থ হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কাজ করানোর জন্য এখানে এনেছেন। আমি ব্যাপারটা বোঝার জন্য আপনার সঙ্গে কথা বললাম। আপনি কদিন পরে জানালেন, "হ্যাঁ, তিনি চাইছেন যেন, আমি খুব ভালোভাবে কাজটা দেখি।" আমি কাজ দেখতে লাগলাম। তাতে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যায় কমছিল। কাজকর্ম অনেক স্বচ্ছ হচ্ছিল। কিন্তু খুব অল্পদিন পরেই আমার বদলি হয়ে গেল। আমাকে ওখান থেকে সরানো ছাড়া বদলিটার অন্য কোনও দরকার ছিল মনে হয়নি। কারণ আমাকে ডি. আই. জি রেল করা হল। আর ডি. আই. জি রেলকে ডি. আই. জি (ও) করা হল। দুজনেরই অল্প পরে আই জি হওয়ার কথা। আমার ওখানে শেষদিন পর্যন্ত আমাকে আপনি একদিনও বলেননি যে, আমি কিছু ভুল করছি, বা আমার বাড়তি কিছু করা উচিত। অথচ আমাকে অসম্মানজনকভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। আমি একটি কথাও বলিনি। আগের প্রতিটি বদলির মতোই যেদিন অর্ডার পেয়েছি সেদিনই চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছি।

২. আপনি জানেন, আমি যেখানে, যাঁদের মধ্যে বড়ো হয়েছি, তাঁদের জন্য সামান্য কিছুও যদি করতে পারি, তার জন্যই পিছিয়ে পড়া আমার নীলগঞ্জ এলাকায় আপনাদের সকলের সাহায্য নিয়ে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, এবং সেটা সম্পূর্ণ সেকুলার ভাবধারা বজায় রেখে। নীলগঞ্জ কলেজটা কিভাবে কত কষ্ট করে তৈরি করেছি, আপনি জানেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় যখন পঃবঃ উচ্চ শিক্ষা সংসদের গঠন করা 'গাইডলাইন' না মেনে অভিভাবকদের বাদ দিয়ে দাতাদের প্রায় বাদ দিয়ে শিক্ষকসর্বস্ব পরিচালকমন্ডলী গঠন করার নিয়ম করল. তখন আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গেছি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। দেখা করেছি। সুনীল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেছি। সকলেই আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিচালকমন্ডলী করতে বলেছে সেটা ঠিক নয়। পঃবঃ উচ্চ শিক্ষা সংসদের গঠন করা 'গাইডলাইন' অনুসারেই কর উচিত। করা হবে। কিন্তু কয়েক বছরে সে-রকম কিছু করা হয়েছে বলে আমি জানি না।

৩. আমাকে বাদ দিয়েই নতুন কমিটি হয়েছে। আমি সে-ব্যাপারে কোথাও কোনও মন্তব্য করিনি। কিন্তু মনসুর রহমান সাহেব গণমাধ্যমে বলেছেন, "আমরা ওনাকে চেয়ারম্যান করতে চেয়েছিলাম। উনি হতে চাননি।" এই মিথ্যা প্রচার কেন?

৪. আমি কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় একজন ভদ্রলোককে অনুরোধ করে পিন্সিপ্যাল করা হয়েছিল। শিক্ষকসর্বস্ব নতুন কমিটি তিনি যাতে পেনশান না পান তার ষড়যন্ত্র করছিল। আপনার মনে থাকতে পারে, আমি আপনাকে বলেছিলাম। আপনি সুনীল বিশ্বাসকে বলেছিলেন। তখন মনসুর সাহেব ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্য আমাকে কলেজে যেতে বলেন। আমি যাই। কথা বলতে গেলে বর্তমান পরিচালকমন্ডলীর অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় নমিনি, তৎকালীন লালপার্টির এম. পি-র দাদা পরিচালকমন্ডলীর সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও আমার উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তোলেন। যদি কলেজ তৈরিতে আমার ভূমিকার কথা ধরা নাও হয়, মনসুর সাহবের তখন জানানো উচিত ছিল যে, তিনিই আমাকে ডেকেছেন। তিনি কেন সে-কথা বলতে পারেনি, তাঁরই জানা। বাধ্য হয়ে আমাকে কথা বলতে হয়েছিল।

৫. সেই কথা প্রসঙ্গে যাতায়াতের কথা এসে গিয়েছিল। আমার সাধারণ বাসে এবং সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনে করে যাতায়াতের প্রসঙ্গ তুলে এম. পি সাহেবের দাদা মন্তব্য করেছিলেন, "এ-সব তো আপনার বিলাসিতা!" উপস্থিত মনসুর রহমান সাহেবও এর কোনও আপত্তি করেননি। তাহলে কি আমাকে অপমান করার জন্যই ডাকা হয়েছিল? তাঁরা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন বলে গর্ববোধ থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে কেউ সৎ

থাকলে তাকে নিয়ে এ-রকম উপহাস করবেন? এতটা ঔদ্ধত্যও কি বাঞ্ছনীয়?

৬. গতবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির সময়, আমরা সরকারের কাছ থেকে এক পয়সাও সাহায্য না পাওয়ার পরও এস. সি- এস. টি-র জন্য সংরক্ষণের নামে আমাদের সিট ব্লক করে রাখলেন অথচ যাঁরা সরকারি সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের ছেড়ে দিলেন। আমি এই অসততা ও পক্ষপতিত্বের অভিযোগ জানিয়ে উচ্চশিক্ষা বিভাগে চিঠি লিখলাম। আপনার মাধ্যমে সুনীল বিশ্বাসের সঙ্গেও কথা বললাম। কিন্তু যাঁরা এই অন্যায় কাজ করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি না। এবারও তাঁদের আবার সেই কাজেই দেখলাম।

৭. আমরা নীলগঞ্জে একটা বি. এড কলেজের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। গত বছর হয়নি। এ-বছর পঃবঃ উচ্চশিক্ষাসংসদ পরিদর্শন করে খুব ভালো সুপারিশ করেছে। কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে আপত্তি থাকায় উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে অনুমোদনের আদেশ বের হয়নি। আমি পার্টির জেলা নেতা নিরুপম চৌধুরী, জোনের নেতা হরেন দাস, শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নেতা দলীপ সরকার, সকলের সঙ্গেই কথা বলেছিলাম। যখন নীতিগতভাবে জেলার অন্যত্রও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে এবং এরজন্য সরকারের এক পয়সাও ব্যয় নেই, এবং সরকারের সব নিয়ম আমরা পূরণ করছি, তখন আমাদেরটা আটকে দেওয়া হচ্ছে কেন? স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বি এড-এ তো পাঁচ নম্বর আছে। কলেজটা হলে, বি. এড করতে পারলে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের চাকরি পেতে কিছুটা সুবিধা হত। কদিন আগে ব্যাপারটা জানাজনি হতে, হরেন দাস আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি তাঁকে এই কথাগুলিই বলেছি।

৮. আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক আগে পি-এইচ ডি করলেও, তার পরে যাদবপুর থেকে এম. বি. এ করেছিলাম বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই ডি. লিট-এর জন্য থিসিস জমা দিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ফেলে রাখছিল। বছর ৪/৫ হলে আমি 'উইথড্রয়াল'-এর জন্য দরখাস্ত করলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখন তাঁরা চিঠি দিয়ে জানালেন, আমাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমাকে ডি. লিট দেওয়া যাচ্ছে না। আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, থিসিসের সব কপি দেখতেই পাঠানো হয়নি। আমি রিপোর্টের কপি চেয়ে দরখাস্ত দিলাম। ওরা তার পরের তারিখে

আবার থিসিস দেখাতে পাঠালেন। কিন্তু তার রিপোর্ট আমার পক্ষে এল। কিন্তু যেহেতু আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, চেপে গেলেন। আমি একদিন পবিত্রবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুনীলবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর পরামর্শ মতো আমি সুনীলবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি কথা বললেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'দেখছি দেখছি' করে আমাকে আরও বছর দুয়েক ঘোরালেন। আমি অবশেষে থিসিস ফেরত পাবার জন্য হাইকোর্টে গেলাম। হাইকোর্টে আমি এফিডেভিট করে বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে তিনজনের সুপারিশ লাগে। পি. কে. সিনহা, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং পল্লব সেনগুপ্ত আমার থিসিস রেকমেণ্ড করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে এফিডেভিট দিতে বলা হল। তাঁরা সময় নিয়ে নিয়ে বছর খানেক কাটালেন। এফিডেভিট দিলেন না। হাইকোর্ট আমার আবেদন মঞ্জুর করল। হাইকোর্টের আদেশে তাঁদের সামান্য লজ্জাবোধ হল কি না জানি না। কিন্তু এই ভেবে খুশি হয়ে থাকবেন যে, আমার ডি. লিট-টা আটকে দিতে পেরেছেন। কিন্তু কেন এমন হবে?

৯. গত বছর দিল্লির একটা বেসরকারি সংস্থা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে একটা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। আমি সরকারের অনুমোদন চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের এ-ব্যাপারে নির্দেশ হল, সরকারি কাজের বাইরের কোনও কাজের জন্য পুরস্কার হলে প্রতিটি আবেদনের ঔচিত্যের ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু সে নির্দেশের পুরোটা না পড়েই (খুব সম্ভবত শুধু শিরোনামটা দেখেই) ভুলভাবে আমাকে জানানো হল, এম. এইচ. এ পুরস্কার না নেওয়ার মতো প্রকাশ করায় অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। আমার যতদূর জানা আছে, এম. এইচ. এ-র এ-রকম কোনও আদেশ নেই। আমি কপি চাইলাম। দিতে পারলেন না। আমি ডি. জি শ্যামল দত্ত, এবং তাঁর কথা মতো ডি এস, হোম (পুলিশ), পি. চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে মিনিস্ট্রি অফ পারসোনেলের (এম. এইচ. এ-র নয়) সার্কুলার দেখালেন। সেই সার্কুলারে যে অনুমতি দেওয়ার সুযোগ আছে সেটা বের করে আমি দেখালাম। তিনি ওপরওয়ালার দিকে দেখালেন। আমি সার্কুলারের কপি নিয়ে হোম সেক্রেটারী, এ. কে. দেবের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু যেহেতু ভুল করে হলেও একবার না করে দিয়েছেন, তাঁরা সেই সিদ্ধান্তেই অনড় থাকলেন। ততদিনে পুরস্কার দেওয়ার তারিখ চলে গেছে। আমি হোম

পুলিশের মিথ্যা করে এম. এইচ. এ-র নাম টেনে দেওয়া মেমো বাতিল করার জন্য চিফ সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করলাম। ডি. এস. হোম (পুলিশ), এ সেগগুপ্ত তার উত্তরে লিখলেন যে, আমাকে পুরস্কার নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না।

আমি চিফ সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করেছি, হোম পুলিশের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে। তাঁরা আমার আবেদন অগ্রসরিত করতে পারেন। নাও পারেন। কিন্তু এ-রকম উত্তর দিতে পারেন না। আমার প্রথম আবেদনের প্রতিক্রিয়ায়ও আমাকে অনুমতি দিতে পারতেন। না দিতেও পারতেন। কিন্তু যে-রকম চিঠি লিখেছেন সে-রকম মিথ্যা অজুহাত দিয়ে লিখতে পারেন না। আমি যদি শ্রীযুক্ত দেব, শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে কোর্টে যাই, আমি নিশ্চিত, আমার পক্ষে অর্ডার পাব। কিন্তু এ-রকম কেন হবে?

১০. ওখানকার স্কুল-কলেজ-পলিটেকনিক-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েক কিলোমিটার রাস্তা করার জন্য আমি নীলগঞ্জ, ভুবনপুর, রাজধানীতে গত ১০/১১ বছর ধরে অনুরোধ করে আসছি। এত উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। ওই রাস্তাটুকু কিছুতেই করা হচ্ছে না।

১১.হ্যাঁ, এর আগেও হয়েছে। এখনো প্রচার করা হচ্ছে যে, আমি ভোটে দাঁড়াতে চাই বলে এ-সব করছি।

১২. আপনি জানেন, আমি বর্তমান শাসক (তখন শাসকদল ছিল না) দলের হয়ে মিটিং-মিছিল করেছি। আমার পরিবারের সব সদস্য এখনো এই দলের সঙ্গে আছে। তার পরেও আমার পথে কেন এ-রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে?

আমি তো অন্যায় কোনও কাজ করছি না। তবুও, আমার যদি মনে হয়, আমাকে অন্যায়ভাবে সব জায়গায় আটকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে; আমার যদি মনে হয় যে, প্রতি পদক্ষেপেই আমার গলা টিপে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে; তাহলে আমার মনে ক্ষোভ জন্মাবে না?

৭

আরও দুয়েক লাইন হয় তো লিখত। তার আগেই ফোনটা বেজে উঠল। ধরতে রোজ সকালের ধ্রুবজ্যোতি বোস বলল, "দাদা, আপনার বুকের পাটা আছে।"

"এ-কথা বলছেন কেন?"

"দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে এদেরকে সবাই যমের মতো ভয় পায়। সেই অবস্থায় আপনি এদের কাগজেই এদের কাপড় খুলে দিয়েছেন দাদা। লোকে তো ভাবতেই পারছে না।"

"ভাবার জন্য আপনাদের কাগজ আছেই।"

"না দাদা। সেটা জানানোর জন্যই ফোন করা। আমি আজ তারানন্দে জয়েন করলাম।"

"বেতন বাড়ল।"

"হ্যাঁ দাদা। প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। ওখানে অনেক দিন ছিলাম। ছাড়তে খারাপ লাগছিল। কিন্তু খরচ বেড়ে গেছে। মেয়েটা স্কুলে যাচ্ছে। আর চলছিল না। তা মনসুর রহমানের আপনার ওপর এত রাগ কেন?"

"সেটা তো তিনিই বলতে পারবেন।"

"আজ রিঅ্যাকশান নিতে গিয়েছিলাম। তো সুনীল বিশ্বাসের কাছে ধন্যে দিয়ে পড়ে আছে। কিছু একটা করতেই হবে। আর আপনাদের জোনাল নেতা, হারাণ দাশ না কি যেন নামটা?"

"হরেন দাস?"

"তাই বোধহয় হবে। তাকেও ডেকে এনেছে। আপনার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে প্রচার করতে হবে, সে-সব ঠিক করা হচ্ছে।"

হরেন দাসদের টিভি-তে বক্তব্য শুনেই তার মনে হয়েছে, তারা কি বোঝাবে। সংগঠিত দলের এটা একটা সুবিধা। একটা মিথ্যা কথাও মিটিং করে ঠিক করে সবাই একরকম বলতে পারে। কিন্তু খুব বেশি দিন কি মানুষকে এমন করে ভুল বোঝানো যাবে? বলল, "করুক। কিন্তু এলাকার লোক আমাকে জানেন। মিথ্যা প্রচার করলে উলটো ফল হবে।"

"তাই হোক দাদা। ছোটভাইকে মনে রাখবেন। আমি সময় পেলেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

"আসুন।"

কামাল ফোন ছেড়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় এগারটা বাজে। টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়ল

৮

পরের দিন প্রায় সব কাগজে তার বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং শাসক দলের নেতাদের তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকে নিন্দা করে প্রতিবেদন বের হল। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ায় এক প্রাক্তন আমলা তাকে 'অনেস্ট হুইসেল ব্লোয়ার' রূপে উল্লেখ করলেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে শাসকদলের নেতাদের আস্ফালনের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট আইনজীবীরা মত প্রকাশ করলেন।

শাসকদলের নেতারা উপলব্ধি করে থাকবেন যে, কামালের প্রবন্ধের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বেশি লাফালাফি করাতে তাঁদের লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। অতএব ইতি টানতে হবে।

কামাল অফিসে বসে ফাইল দেখছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব প্রকাশ রায় ফোন করে বললেন, "কামাল! আপনি একবার আমার অফিসে আসবেন?"

"কখন স্যার?"

"সারাদিন তো সাংবাদিকে ভর্তি হয়ে থাকে। আপনি সন্ধ্যার দিকে, ছটা, সাড়ে ছটা করে আসুন।"

"চলে যাব স্যার।"

ফোন রাখতেই অফিস-অর্ডালি, আরক্ষী নীপক চকলানবীশ ঘরে ঢুকল, "স্যার, আপনাকে কি হোম সেক্রেটারী ডেকে পাঠিয়েছে স্যার?"

কামালের খটকা লাগল। স্বরাষ্ট্র সচিব তাকে এই মাত্র ফোন করেছিলেন! ফোন না রাখতেই নীপক খবর পেল কি করে? জানতে চাইল, "কেন বলুন তো?"

নীপক বলল, "স্যার, আমি ওপরে ডাক নিয়ে গিয়েছিলাম। তা আমি আপনার সঙ্গে কাজ করি জানে না তো। আমার সামনেই আলোচনা করছিল।"

"কি আলোচনা করছিল?"

নীপক একটু সাবধান হওয়ার ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল, "স্যার, মুহুরি সাহেব বলছিল, "বড় বাড় বেড়েছে। ডেকেছে। এবার ঝাড় হবে।' তার উত্তরে মজুমদার সাহেব বলল, 'ওটাকে কেন যে এখনো রেখেছে, বুঝতে পারি না। খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। কে কি করছে, কাঠি দিয়ে বেড়ানো। আরে বাবা মন্ত্রীরা কে কি করছে সেটা দেখার দায়িত্ব তোকে কে দিয়েছে? তোর যদি ইচ্ছে হয়, তুইও পাঁচটা গাড়ি চড়্।' অমনি

মুখার্জি সাহেব বলল, 'এবার সুনীল বিশ্বাস খেপেছে। এবার বাছাধন বুঝতে পারবে। শুনলাম পার্টি থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এক্সপ্লানেশান চাইবে।' আপনাকে কি সত্যি ডেকে পাঠিয়েছে স্যার? আর সুনীল বিশ্বাস নাকি আপনাকে রুচিহীন বলে, নম্রতার দলে যোগ দিতে বলেছে স্যার?"

কামাল কি বলবে ভাবছিল।

নীপক বলে চলল, "আমাদের লালপুলিশ সংগঠনের অফিসে এ-নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল স্যার। সবাই বলছিল, 'এটা সুনীল বিশ্বাসের বলা অন্যায় হয়েছে।' বলছিল, 'সাহেবের কিছু ক্ষতি করলে আমরা সাহেবের পাশে থাকব।' সত্যিই ডেকে পাঠিয়েছে স্যার?"

"হ্যাঁ।"

"দেখুন স্যার। ওরা ঠিক খবর রাখে। চামচা তো স্যার। নিজেরা যেমন অসৎ, তেমনি অসৎ নেতাদের সাথে ভাব। আপনাকে দেখতে পারে না স্যার।"

"আপনারা দেখতে পারেন তো! সবাই দেখতে পারলে চলবে কেন?"

নীপক কি বলতে যাচ্ছিল।

প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য কামাল বলল, "এ. ডি. জি সাহেব আছেন?"

"দেখে এসে বলছি স্যার।" নীপক ছুটে বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরে এসে বলল, "না স্যার। কোথায় বেরিয়েছেন।"

"ফিরলে আমাকে খবর দেবেন।"

"ঠিক আছে স্যার।" নীপক বেরিয়ে গেল।

৯

কামাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় মহাকরণে পৌছে দেখল, সাংবাদিক/চিত্র-সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানরা কলম এবং ক্যামেরা তাক করেই দাঁড়িয়ে আছে। কামাল গাড়ি থেকে নামতেই সকলে ঘিরে ধরল, "আপনাকে কি হোম সেক্রেটারী ডেকে পাছিয়েছেন?"

কামাল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"কি নিয়ে কথা বলবেন?"

"সেটা তিনি বলতে পারবেন।"

"আপনি তো গেস করছেন!"

"এক্ষনি তো জানতে পারব। গেস করার দরকার কি?"

"আপনার লেখা নিয়ে কি আলোচনা হবে?"

"সেটা তিনি জানেন?"

কামাল গিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের ঘরে ঢুকে পড়ল। তাঁর ব্যক্তিগত সহায়ক কামালের আগমন সংবাদ দিতেই তিনি ডেকে পাঠালেন।

প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর তিনি জানতে চাইলেন, 'তোমার লেখা নিয়ে তো প্রচুর হইচই হচ্ছে। কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে তুমি কি করবে?"

কামাল একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, "স্যার, প্রমাণসমেত দরকার হলে ছবিসমেত আমার যুক্তি সাজিয়ে আইনের সমর্থন উল্লেখ করে উত্তর দেব। কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে তো আমার দিকটা পরিস্কার করার একটা সুযোগ পাব স্যার।"

"এ-রকম বলছ কেন?"

"স্যার, আপনি কি প্রবন্ধটা পড়েছেন?"

"পড়েছি।"

"তাহলে তো স্যার আপনি বুঝতে পেরেছেন, আমি পুলিশের ভাবমূর্তি ভালো করার জন্য লিখেছি। অধিকাংশ লোক প্রবন্ধটা না পড়েই, কোনও সাংবাদিক প্রসঙ্গের বাইরে কিছু তুলে প্রশ্ন করছেন, আর যার যা খুশি বলে যাচ্ছেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে না পড়ার জন্য আমি কিছু বলতে পারছি না। প্রায় মুখ বুঝে আঘাত সহ্য করে যেতে হচ্ছে। কৈফিয়ৎ চাইলে আমি গুছিয়ে আমার বক্তব্য বলতে পারব। সবাই জানতে পারবে।"

"প্রসঙ্গের বাইরে কিছু তোলা বলতে তুমি কি বলতে চাইছ?"

"স্যার। ধরুন, আমি বললাম, 'আপনি যদি আমাকে মারেন, আমি আপনাকে মারব।' এখন কেউ যদি 'আপনি যদি আমাকে মারেন' অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু বলেন যে, আমি লিখেছি, 'আমি আপনাকে মারব'। তাহলে উদ্ধৃতিটা তো মিথ্যা নয়। কিন্তু যে অর্থ প্রকাশ পেল, তা আমার লেখার থেকে ভিন্ন। আমার প্রবন্ধ নিয়ে, স্যার, এরকমই হয়েছে এবং হচ্ছে।"

"যেমন?"

"যেমন আমি বোঝাতে চেয়েছি, পুলিশের ভাবমূর্তি ভালো করতে হলে পুলিশ যাদের অধীনে কাজ করে তাঁদের ভাবমূর্তি ভালো করতে হবে। না হলে, আমি অসৎ হয়ে নীচের লোককে সৎ হতে বললে তারা তো ছেড়ে

কথা বলবে না। সেটা বোঝানোর জন্য পুলিশ যে-মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করে তাঁদের সম্বন্ধে গণমাধ্যমে কি রকম খবর বের হয় তার দুয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে মনসুর রহমানের অন্যায়ভাবে একাধিক গাড়ি ব্যবহারের ঘটনা যে-কাগজে বেরিয়েছিল, সেটাও আছে। সাংবাদিকরা সেটাকে উদাহরণ-উদ্ধৃতি হিসেবে না দেখিয়ে আমার বক্তব্য হিসেবে পেশ করছে।"

"আর?"

"প্রবন্ধে আমি কোথাও স্ত্রীকে অফিসে বা মেয়েকে স্কুলে ড্রপ দেওয়ার কথা উল্লেখই করিনি। যারা এ-রকম করে তাদের প্রতি সহানুভূতি কুড়ানোর জন্য সুনীল বিশ্বাস না লেখা কথা আমার প্রবন্ধে জুড়ে দিয়ে সুবিধা মতো নিজের কথা বলছেন।"

"ঠিক আছে, সাংবাদিকরা তোমার বক্তব্য আউট অফ কনটেক্সট উদ্ধৃত করছেন এবং নেতারা তোমার বক্তব্য বিকৃত করে তোমাকে আক্রমণ করছেন। কিন্তু তুমি এ-কথা তো মানো যে, সরকারি চাকরি করে সরকারের সমালোচনা করা যায় না।"

"হ্যাঁ স্যার, মানি। আমাদের আচরণ বিধিতে সে-কথা বলা আছে।"

"তাহলে তুমি সরকারের সমালোচনা কর কি করে?"

"স্যার, আচরণ বিধিতে বলা আছে, আমি সরকারের কোনও নীতির (অর্থাৎ পলিশি-র) সমালোচনা করতে পারব না। আমি সরকারের কোনও পলিশির সমালোচনা করিনি স্যার। আমি কোরাপ্‌শানের বিরোধিতা করেছি। কোরাপ্‌শান দূর করতে বলেছি। সরকারের কর্তারা যদি বলেন যে, 'কোরাপ্‌শানই আমাদের নীতি', তাহলে আমার সাজা হবে। কিন্তু স্যার, আমার মনে হয় না যে, কর্তারা বলবেন যে, দুর্নীতিই আমাদের নীতি। তাছাড়া স্যার, রাইট টু ইনফর্মেশান অ্যাক্ট পাশ হবার পর, আমি যা লিখেছি তাতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না।"

—"হ্যাঁ, কাগজেও সে-কথা লিখেছে। কিন্তু রাইট টু ইনফর্মেশান অ্যাক্টে তো জনগণকে জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাতে সরকারি কর্মচারী হিসেব তোমার কি সুবিধা হবে?"

"জনগণ জানতে চাইলেই যা জানাতে সরকার বাধ্য, তা প্রকাশ করা কি অন্যায় বিবেচিত হতে পারে স্যার? তাছাড়া, আমি কোনও অপরাধ

করেছি কি না, সেটা বিচার করার সময় আদালত অবশ্যই আমার আচরণ বিধির সঙ্গে সঙ্গে, দেশের সংবিধান, রাইট টু ইনফর্মেশান অ্যাক্টের মতো আইনগুলি, আমার প্রবন্ধ দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য লেখা কি না, সেটা বিবেচনা করবে স্যার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আদালতকে আমি বোঝাতে সমর্থ হব যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য লিখেছি।"

"শোনো কামাল। তোমার সঙ্গে আমি এ-নিয়ে তর্ক করব না। তুমি পড়াশোনা কর। আইন-কানুনের খবরও রাখ। কিন্তু তুমি এটা তো মান যে, এরজন্য সরকার এবং বিশেষ করে শাসকদল বিব্রত হচ্ছে।"

"স্যার যে অন্যায় ঘটছে, তার জন্য শাসকদলের নেতারা বিব্রত হচ্ছেন না? আমি লিখলেই বিব্রত হচ্ছেন? অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন যে, অন্যায় করাটা কোনও দোষের নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলাটা-ই দোষের। যারা অন্যায় করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে শাসকদলের নেতাদের বিব্রত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। আমার অন্যায়ের বিরোধিতায় তাঁরা বরং খুশিই হতেন। তাদের অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলেই তাঁরা বিব্রতবোধ করছেন। এটা তাঁদের দোষ স্যার। আমার নয়। তাঁরা খারাপ হতে যাবেন বলে আমি কেন ভালো হব নাস্যার?"

"তুমি ভালো হও। আমাদেরও একটু ভালো থাকতে দাও।"

"বলুন স্যার, আমি কি করতে পারি?"

"আমি শুধু তোমার সিনিয়র অফিসার হিসেবে বলছি না। তোমার থেকে আমি বয়সে বড়ো তো?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তো দাদা হিসেবে ছোট ভাইকে বলছি, তুমি আর এ-রকম কিছু লিখো না।"

তিনি এমনভাবে বললেন যে, কামাল কিছুই বলতে পারল না।

তিনি বলে চললেন, "আমরা তোমাকে একটা চিঠি দেব যে, ভবিষ্যতে এ-রকম কিছু লেখার আগে তুমি অনুমতি চাইবে। তোমাকে তার কোনও উত্তর দিতে হবে না।"

"না স্যার, সেটা আমার পক্ষে মানা সম্ভব হবেনা। আপনারা চিঠি দিলে, আমি অবশ্যই একটা উত্তর দেব।"

"তাহলে আমরা কোনও চিঠি দেব না। তুমি, আমার সঙ্গে যে-কথা

হল তার রেফারেন্স দিয়ে এক লাইন লিখে দাও যে, তুমি ভবিষ্যতে আর এ-রকম লিখবে না।"

"সেটা স্যার আরও সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"স্যার, প্রথমত আমি কি লিখতে পারি, না পারি, তা আচরণ বিধিতে পরিস্কার লেখা আছে। দ্বিতীয়ত আমি এমন কিছু লিখিনি, যা আমি লিখতে পারি না। কাজেই আমার লেখার কোনও প্রশ্নই নেই। তৃতীয়ত, আপনি নিজেও খুব ভালো করে জানেন, আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন সেটা আপনি নিজে থেকে বলছেন না। কেউ আপনাকে বলেছেন বলে আপনি বলছেন। আর এই বলার সিদ্ধান্তটা হয় তো তাঁরও নিজের নয়। তাঁকেও কেউ-বা কেউ কেউ বলতে বলেছেন। তাঁরা যখন আমার প্রবন্ধের বিকৃত ব্যাখ্যা করে আমার প্রতি বিষোদ্গার করতে কোনও কসুর করছেন না, তখন আমার এই লিখে দেওয়াকে 'মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পাওয়া' বলে প্রচার করতে মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না। সেটা হবে আমার মৃত্যুর থেকে ভয়ঙ্কর। তার থেকে স্যার আমি আপনার কৈফিয়তের উত্তর দেওয়া বেশি পছন্দ করব। তাতে যা হয় আমি তার সামনা করার জন্য প্রস্তুত আছি।"

"তুমি যদি বলো, লেখাটা আমি আমার কাছেই রেখে দেব। কাউকে দেব না। সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।"

"স্যার, কোনও কিছু গোপন থাকে না। স্যার মোস্ট সিক্রেট ফাইলের কনফিডেন্সিয়াল নোটও প্রকাশ হয়ে যায়। আমরা তো কেউই প্রকাশ্যে ঘুষ খাই না স্যার। কিন্তু কে ঘুষ খায়। কে খায় না, তা সবাই জেনে যায়। কোনও কিছুই গোপন থাকে না স্যার।"

"তা ঠিক, গোপন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও ফাঁস হয়ে যায়। তাহলে?"

"স্যার, আমি লিখে কিছু দেব না স্যার।"

"অলোকবাবুও সি. এমের কাছে একটা নোট পাঠিয়েছিলেন। তাতেও তিনি এ-রকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।"

কামাল কিছু বলল না।

একটু থেমে তিনি বললেন, "ঠিক আছে। তুমি তো বললেই। ঠিকই। আমি তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার মালিক নই। আলোচনা করি। কিছু জানানোর থাকলে জানাব।"

কামাল অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এল।

সব সাংবাদিক, চিত্র-সাংবাদিক, এবং ক্যামেরাম্যানরা ঘিরে ধরল।

কামাল শুধু একটি কথাই বলল, "কিছু বলার থাকলে তিনিই বলবেন। আমি কিছু বলব না।"

তবুও নানা প্রশ্ন করতে করতে তারা গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে এল।

১০

বাড়ি ফিরে দেখল, শরৎ দত্ত মহাশয় এসে বসে আছেন।

কামাল জিজ্ঞেস করল, "আপনি? কখন এলেন?"

তিনি বললেন, "কবিতা কইল, আপনি ছটার দিকে চইলা আসেন। তা ছটার সময়ই আইলাম।"

"হ্যাঁ, আজ আমার ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আপনাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে। বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।"

"আপনার কাছে আমি কোনও কাজের লাইগা আসি নাই।"

"তাহলে?"

"আপনি তো আমাগোর পার্টির বিরোধী লোক নন। কিন্তু পার্টির সঙ্গে আপনার বিরোধ হইয়া যাইতেছে। সেইডা তো ঠিক নয়।"

"আপনি কি আমার প্রবন্ধটা পড়েছেন?"

"আমি তো পড়ছি। কিন্তু মনে হয়, আমাগোর বড়ো নেতারা পড়েন নাই।"

"আর পড়লেই-বা কি হবে? আপনাদের নেতারা তো পুলিশের সভায় গিয়ে দলের জেতা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করছেন।"

"হ্যাঁ, আমরা যখন লালপার্টি করতাম। পুলিশ আমাগোর নামে মিথ্যা মামলা দিয়া আমাগো হ্যারাস করত গিয়া। আর আজ আমরা রুলিং-পার্টি হইয়া ভোটে জিতার জন্য পুলিশের কাছে দরবার করছি গিয়া।"

"দেখুন, যে পার্টিই ক্ষমতায় থাক, আমি চাই পুলিশ নিরপেক্ষ থাক। কারও পক্ষে না হোক। এই কথাটাতে আপনার পার্টির লোকেরা চটে যাচ্ছেন কেন, আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমগোর পার্টির নেতাদের কথা ছাড়েন। আপনি তো বাঙালি

উদ্যোগের সঙ্গে আছেন। আছেন কি না?"

"আছি।"

"তা আপনার রোজ সকালে তো একটাও প্রতিবাদ দেখলাম না।"

কামাল ইঙ্গিতটা বুঝল। রাম ভরসা আচার্য অলোক সেনগুপ্তর বন্ধু। যেদিন থেকে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, রোজ সকাল সরকারের অন্ধ সমর্থক হয়ে প্রায় লালপার্টির কাগজ হয়ে গেছে। সে-ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বলল, "শুধু রোজ সকালের কথা বলছেন কেন? আনন্দ সকাল পর্যন্ত আপনাদের পার্টির সমর্থক হয়ে গেছে।"

"আপনি আবারও ভুল কইরতাছেন। লালপার্টির নয়, ওরা রাম ভরসার সাপোর্টার হইছে। সেডাও দামী বিজ্ঞাপনের লোভে। সলিম আইসতাছে না। রাম ভরসা তো সলিমেরে আইনতাছে। সেইডাই নাকি প্রগতিশীলতা।"

কামালের একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল, "দেখুন, আপনারা সলিমকে আনছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে অনুরোধ করে আনছেন। জমি জোগাড় করে দিয়ে আনছেন। কেন? নিশ্চয় এই জন্য নয় যে, তারা পার্টিকে অনেক টাকা ঘুষ দেবে। তাহলে? এই জন্য আনছেন যে, তারা এসে কারখানা করলে বেশ কিছু লোক কাজ পাবে। তা সলিম তো নীলগঞ্জে যাচ্ছে না। আমরা সোসাইটি করে কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করাতে তো কয়েকশো লোকের কাজ সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে, সলিমকে বিদেশ থেকে অত তোয়াজ করে আনা যদি উচিত হয়, আপনাদের পার্টির স্থানীয় লোকদের কি আমাদের সাহায্য করা উচিত নয়?"

"অবশ্যই উচিত।"

"তাহলে তাদের জিজ্ঞেস করুন, সাহায্য তো দূরের কথা, কেন বিরোধিতা করছে।"

"দেখুন, আপনি একটা জায়গায় বড়ো ভুল কইরতাছেন।"

"কোনও জায়গায়, বলুন।"

"আপনি ধইরা লইতেছেন যে, দেশের সবার সমান অধিকার আছে। আপনারও আছে। আপনি যেহেতু ভালো কাজ কইরতাছেন। কাজেই আপনাকে সহযোগিতা করতে হইব। কিন্তু আমাগোর নেতারা তো সেডা ভাবতাছেন না।"

"আপনাদের নেতারা কি ভাবছেন?"

"ভাবতাছেন, 'আমরা রুলিং-পার্টির লোক। আমরা মালিক। অর্থাৎ কি না রাজা। দেশের কিছু করতে হইলে আমরাই করব। আমরা না করলে আর কেউ করবে না। যদি কেউ করে আমরা আটকে দিতে পারি। তাই যদি আটকে না দিই তার জন্যই আমাগো প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমাগো মাইন্যা চলা উচিত।' আপনি সেডা করছেন না। আপনি ভাবতাছেন, 'ওদের কাজ ওরা করছে না। আপনার সঠিক কাজে ওরা বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলে জনগণের ওদের উৎখাত করা উচিত।' ভাবতাছেন কি না?"

"ভাবছি।"

"বিরোধটা সেইখানডাই।"

কামাল বোঝার চেষ্টা করছিল। তাঁর কথার মধ্যে যেন অনেকটা বাস্তব সত্য আছে। তাকে এ-ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। বলল, "তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?"

"আপনি কাজ করতে চান। আপনাকে আপোষ করতে কইতাছি না।"

"তবে?"

"আপনাকে আরও সাবধান হইয়া চলতে হবে।"

১১

কথার মাঝেই ফোনটা বেজে উঠল। ধরতে সাম্প্রতিকীর সত্যানন্দ বোস বলল, "দাদা, আপনাকে নিয়ে কাগজগুলো কি লড়ে গেছে, দেখেছেন? ডেলি টাইম্‌স তো একদম প্রথম পাতায় লিড নিউজ করেছে। 'ফ্রেণ্ড অফ ইন্ডিয়ার'র বাংলা এডিশানে তো লিড নিউজের সঙ্গে সঙ্গে এডিটোরিয়ালও লিখেছে।"

"সত্যানন্দ কাগজগুলো লড়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু আমার জন্য লড়েনি। আমি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছি তার বিরুদ্ধে লড়েছে। আমাকে যারা অন্যায়ভাবে থামিয়ে দিতে চেয়েছে, তার বিরুদ্ধে লড়েছে।"

"তাতো বটেই। আপনি দুর্নীতি করে ধরা পড়লে কি আর আপনার পক্ষে লিখত? আপনাকে ঝাড় দিত। আচ্ছা দাদা সত্যি করে বলুন তো, "আপনার কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে কোনও চিঠি দিয়েছে কি?"

কামাল বলল, "না, আমি কোনও চিঠি পাইনি।"

"তাহলে কি একেবারেই চেপে গেল? আপনাকে তো বিশ্বাস নেই।

ভাবছে, আবার কি লিখে দেন! তাতে নতুন বিপদ! আমার মনে হয়, তাহলে, লম্ফঝম্পই স্যার হল। কিছু করতে সাহস করল না। আসলে সব কাগজ আর চ্যানেলগুলো এমনভাবে ওদের বিরোধিতা শুরু করেছে যে, ওরা এতটা আঁচ করতে পারেনি।''

''হতে পারে।''

'''হতে পারে' না। এটা-ই হয়েছে। না হলে, সুনীল বিশ্বাসের পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্যাঁচ কষাটা তো আপনি দেখেননি। দেখুন দাদা। আপনারা সব সময় খবরের কাগজের বাপান্ত করেন। খবরের কাগজ কিন্তু ন্যায়ের পাশেই দাঁড়ায়।''

''কখনো কখনো তো নিশ্চয়।''

''এখনো কখনো, কখনো? আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কখনো কখনো নয়। সব সময়ই দাঁড়ায়।''

———